
চিচিং ফাঁক
কৃষ্ণেন্দু দে

চিচিং ফাঁক

কৃষ্ণেন্দু দে

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য বি. এ., বি.টি
৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮৬

মূল্য : সাত টাকা

মুদ্রাকর :
বিজয়কৃষ্ণ ধন
নবদুর্গা প্রেস
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ ঃ

—স্নেহের মা-মণি

ও

বাবাই কে—

॥ একটি চিঠি ॥

আমার স্নেহের ছোট্ট পাঠক পাঠিকারা,

কেমন আছ তোমরা ? তোমাদের হাতে আজ তুলে দিচ্ছি এই 'চিচিং ফাঁক' বইখানা। ভাবছ এত নাম থাকতে বইটার নাম কেন রাখলাম 'চিচিং ফাঁক'। শোন তবে। তখন কলকাতায় পড়ি। ছুটিতে আসতাম বাড়িতে। পাড়ার কাকিমা, জ্যেঠিমা, বৌদি আর দিদিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আর বলতেন, "তুই এসেছিস, আমাদের হাড় জুড়োল। এবার সামলাও বাপু তোমার চ্যালা চামুণ্ডাদের।"

আমার চ্যালা চামুণ্ডা বলতে বোঝাত তোমাদের মত খুদে দস্যি ছেলেমেয়েগুলোকে। তাদের হাড় জুড়াত কিনা জানি না, তবে দুপুরের ঘুম নিরাপদ হ'ত সেটা আমি ভালই বুঝতাম। কারণ ঐ দস্যি ছেলেমেয়েগুলো দুপুর বেলায় দল বেঁধে চলে আসত আমার ঘরে গল্প শোনার লোভে।

ওদের মা বাবারা কিন্তু রোজ সকাল সন্ধ্যা পড়া আদায় করে নিতেন আমার গল্পের দোহাই দিয়ে। ছুটির একমাস ওদের পড়া চলত ঠিক ঠাক।

তোমাদের মত ছোট্ট ছোট্ট দস্যিগুলোকে গল্প বলতে বলতে কেমন যেন যাদুর ছোঁয়া লাগত আমার মনে। সেই সময়ই আবিষ্কার করেছিলাম একটা সত্য। সত্যটা হচ্ছে, তোমাদের মত ছোট্ট শিশুদের বুকের ভেতর একটা দরজা আছে। সে দরজা খোলার জন্য প্রয়োজন ধাক্কা নয়, 'মন্ত্র'। ঠিক আলিবাবার গল্পের মত। গরীব আলিবাবা দৈবাৎ জেনে ফেলেছিল একটা মন্ত্র,— 'চিচিং ফাঁক'। এই মন্ত্রটা দিয়ে সে ডাকাতদের গুপ্তধনের গুহার দরজা খুলে ফেলেছিল। সন্ধান পেয়েছিল অতুল ঐশ্বর্যের।

ছোট্ট শিশুরা, তোমাদের বুকের দরজা খোলার 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্র হল তোমাদের 'মনের মত গল্প'। তোমাদের মনের মত গল্প সংকলন করার চেষ্টা করেছি বলেই এই সংকলনটার নাম দিলাম 'চিচিং ফাঁক।' তোমাদের কাছে অনুরোধ এখনই পড়তে শুরু করো না। বইটা সামনে নিয়ে জোরে জোরে বল 'চিচিং ফাঁক'—তিনবার। ব্যস্, এইবার পাতা ওলটাও। দেখ ত, মন ভরে কিনা? তোমাদের মত দামাল ছেলেমেয়েরাই এই গল্পের নায়ক-নায়িকা। তোমাদের নিয়েই এই গল্প। তোমাদের ভাল লাগলেই আমার শ্রম সার্থক। আশিস রইল তোমাদের জন্য।

ইতি
তোমাদেরই
কৃষ্ণেন্দু দে

পুনশ্চ :

জান, এই সংকলনের প্রথম থেকেই উৎসাহ আর প্রেরণা দিয়েছে শ্রীবিশ্বনাথ দাস এবং শ্রীনৃপেন পাল। শ্রীস্বপনকুমার রায় দিয়েছে শ্রম। প্রীতিবরেষু শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য বহন করেছেন বিভিন্ন দায়িত্ব। প্রেসের এবং অন্যান্য মুদ্রণ কর্মীদের শ্রমের অবদান সংকলনের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। এঁদের সবাইকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা।

কৃষ্ণেন্দু দে

মহালয়া, ১৩৮৯
১৬ই অক্টোবর, ১৯৮২
কালিকা দাস রোড,
কোচবিহার।

———

চিচিং ফাঁক

সূচী

চিচিং ফাঁক

নাট-বল্টুদের বাড়ি। নাট, বলটু, গোলটু, ননটাই, কাঁকন, দাঁতন, তাতন, বাবুয়া ইত্যাদি কোং লিমিটেডের আসর জমজমাট। সেকেণ্ডারী পরীক্ষার জন্য স্কুল ছুটি চলছে। আর ওদের পায় কে! নয়টা বাজতে না বাজতেই সবাই নাট-বল্টুদের বাড়িতে হাজির। দশটার টিফিনটা মাসীমা অর্থাৎ নাট-বল্টুর মা ভালই সাপ্লাই দেন। আজও সিঙ্গাড়া আর কচুরি হচ্ছে খবর দিয়েছেন। ওদের তাই আনন্দের সীমা নেই। চাইনীজ চেকার, লুডো, ক্যারাম খেলা চলছে বটে, মনটা পড়ে আছে রান্নাঘরে। সবার চোখ বারেবারেই রান্নাঘরের দরজার দিকে ঘুরে যাচ্ছে—কম্পাসের কাঁটা যেমন উত্তরের দিকে ঘুরে যায়। 'পেটে খিদে, জিবে জল নিয়ে খেলা জমে ?'—ননটাই জিজ্ঞাসা করে।

কাঁকন বলে, 'আয় তার চেয়ে বরং আমরা ধাঁধা ধাঁধা খেলি।'

'ঠিক, ঠিক'—ক্যারামের গুটি ছত্রছান করে ছড়িয়ে দিয়ে বাবুয়া বলে ওঠে।

কাগজে সবার নাম লেখা হল।

'এক একটা ধাঁধায় এক নম্বর।'—কাঁকন খাতা পেনসিল বাড়িয়ে বলে।

'বল ত কোন্ বুড়া হাঁটে না' ?

'জামবুড়া। জামবুড়া হাঁটে না।'—বাবুয়া বলে ওঠে।

'বাবুয়া এক। বেশ, এবার বল ত কোন সাগরে জল নেই ?'

'ধুৎ, এটা কোন ধাঁধাই না, বিদ্যাসাগরে জল নেই।'

'দাঁতন পেল এক। কোন্ বাচ্চা কাঁদে না?'

'চৌবাচ্চা।'

'নাট পেল এক।'

'আমার নম্বর লাগে না। বলটুকে দিয়ে দাও আমারটা।'

নাট-বলটু কোম্পানীর কান খাড়া হয়ে উঠল। হঠাৎ সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ। গোলটু কপালে চটাস্ চটাস্ দুটো থাপ্পড় মেরে বলে,

'হায়রে কপাল, ভাগ কমল!'

দরজার কাছ থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,

'কইরে, আমার পবনপুত্র ভাগ্নেগণ! দৃশ্যমান হও।'

বল্টু তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে, 'আরে গড়বড় মামা এসেছে! গড়বড় মামা এসেছে।'

নাট বলে, 'গড়বড় না, বল গড়গড়া মামা এসেছে।'

দাঁতন, তাতন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নাট, বলটু, গোলটু, মামা তোমাদের ডাকছেন, সাড়া দাও।'

ওদের ফিক্ ফিক্ হাসিতে জলবিছুটি। ওরা মেয়েদের দিকে চোখ পাকায়। কিন্তু উত্তর দেবার আগেই অদ্ভুতদর্শন গড়বড় মামা ওরফে গুলেশ্বর গড়গড়ি দরজার মাঝখানে হাজির। মামাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন দরজার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। মুখে মৃদু মৃদু হাসি। গায়ে বহু রংয়ের বিচিত্র জোব্বা।

'আহা! আহা! অনেকগুলি শাখামৃগ এবং মৃগী একত্রে নরক গুলজার করিতেছে?'

'নরক না, নরক না মামা, আমরা স্বর্গ রচনা করছি।'—বাবুয়া সগর্বে মামাকে সংশোধন করে দেয়।

'কি বল্লি, স্বর্গ?'—মামা এবার তার গড়গড়ার মত সরু চেহারা ঈষৎ দুলিয়ে নাক কুঁচকে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে থাকেন। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বুক ভরে টেনে নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বলেন,

'—আঃ! গী-দ্যাঁ-কঁচুতি। চিং ফুং ফাঁ'!

'তার মানে ?'—ননটাই জিজ্ঞাসা করে।

'মানে হচ্ছে, অপূর্ব, কচুরীর গন্ধ। আমি ভালবাসি।'

'ভাষাটা কি ?'

'প্রথম অংশ ফরাসী। দ্বিতীয় অংশ চীনা। রাঙ্গাদি, আমি এসেছি। আমার জন্য দুই প্লেট,'—চিঁ চিঁ গলায় গড়গড়ি মামা রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে হাঁক পাড়লেন।

এবার নাট-বলটু এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ মামার পাঞ্জাবী-কাম-আলখেল্লা-কাম-কোটের দিকে তাকিয়ে বলল—

'মামা এটা কি বস্তু ?'

বলটু একটু পরিষ্কার করে বলে—'মানে, যেটা তুমি গায়ে চাপিয়ে আছ ?'

'এটা ? এটার নাম, পাঞ্জাবী ৯০।'

'সে আবার কি ?' সবাই আঁত্‌কে ওঠে।

'হেঁ—হেঁ, বুঝলি না ত। ফ্যাশান বিপ্লব। লেংথ ৫৪″ সাম্নে। পেছনে ৫০″। সাম্নে এক রং। পেছনে আরেক রং। কনট্রাস্ট। দুটো বুক-পকেট। দুটো ঝুল পকেট। সব চেন লাগান। চেনের শেষে তালা লাগান। সেফ্‌ ডিপোজিট। পকেটমারের ফোর ফাদারের সাধ্য নেই পকেটমারিং করে।'

ননটাই মাথা চুলকে বলে, 'জোব্বার ঠিকুজি ত জানলাম। কিন্তু পরনে তোমার এটা কি ?'

'এটা ?' পায়জামার মত একটা কিছু টেনে মামা জিজ্ঞাসা করেন।

'হ্যাঁ।'

'এটা হচ্ছে, চো-ফু-পা।'

'সে আবার কি বস্তু ?'—সকলের চোখ ছানাবড়া।

'এটা হচ্ছে থারটি পারসেন্ট চোস্ত, থারটি পারসেন্ট ফুলপ্যান্ট, থারটি পারসেন্ট পায়জামা এবং টেন পারসেন্ট বিবিধ।'

'তার মানে ?' নাট ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করে।

'মানে ? বিবিধের মাঝে মিলন মহান। জাতীয় সংহতি। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান। মন্দির-মসজিদ-চার্চ আমার চো-ফু-পাতে করে মার্চ। তোদের দাদারা সবাই বীট খেয়ে গ্যেছে।'

'কেমন করে ?' বলটু হাঁ বন্ধ করে প্রশ্ন করে।

'ওদের প্যান্টে কয়টা তাপ্পি ? আমার চো-ফু-পাতে তেইশটা তাপ্পি। মালটি-কালার। ছয়টা পকেট। সাম্নে দুই। পাশে দুই। পেছনে দুই।'—গর্বে মামার মুখ ঝলমল করে। দাঁতের দোকানের ঝাপ খুলে যায়।

বাবুয়া এবার বলে ওঠে—'থাম, থাম মামা, আমাদের মাথা বনবন করে ঘুরছে।'

'বেশ তবে বেশের বিন্যাস বাদ দেওয়া যাক। তা, তোরা কি করছিলি ?' মামা বেতের চেয়ারে দেহ রক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা ধাঁধা খেলছিলাম।'—তাতন ও দাঁতন উত্তর দেয় একযোগে।

'বেশ, বেশ। ধাঁধার খেলা ভাল জিনিস। ব্রেন কালচার হয়।'

'আচ্ছা মামা বলত, কোন্ জিনিস কাটলে বড় হয় ?'—

গড়গড়ি মামা তার বেলের মত চকচকে টাকে বার দুয়েক হাত বুলিয়ে বলেন—'ধুর, তাই হয় নাকি। সব জিনিসই কাটলে ছোট হয়।'

নাট-বলটু কোম্পানী হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে।

'মামা ফেল, মামা ফেল। পুকুর কাটলে বড় হয়।'

'আচ্ছা মামা, কোন জিনিস টানলে ছোট হয় ?'—কাঁকন প্রশ্ন করে।

'বাবুয়ার কান নয় কিন্তু'—ননটাই বাবুয়ার হাতের নাগালের বাইরে সরে গিয়ে ফোঁড়ন কাটে।

প্রশ্ন শুনে মামা ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বলেন—'অসম্ভব, সব জিনিসই টানলে বড় হয়।'

সবাই মামাকে ঠকাতে পেরে বেজায় খুশী।

দাঁতন এবার দাঁত বের করে হেসে বলে,

'মামা সিগারেট টানলে ছোট হয়। এটাও জান না?'

'এগুলো কোন ধাঁধাই না, কেবল মামা-ঠকান প্রশ্ন। আসল ধাঁধায় আয় না, দেখি তোদের কেরামতি।'

নাট, বলটু বলে ওঠে, 'না মামা, এম্নিতে হবে না। বেট রেখে মানে বাজি রেখে প্রতিযোগিতা হোক।'

'তথাস্তু। আমি পাঁচটা ধাঁধা দেব। তোমরা যে কেউ বা সবাই মিলে উত্তর দিতে পার। যদি সব উত্তর ঠিক হয় তবে'… মামা একটু দম নেন।

'তবে কি মামা?'

'তবে!'—মামা জামার লাল রংয়ের বুক পকেট থেকে চাবি বের করে জোব্বার ঝুল পকেটের তালা খুললেন। বের করে আনলেন ক্যাডবেরী ফাইভ-স্টার। নাট-বলটুদের প্রিয়তম খাবার। সকলের চোখ সাৎ করে চড়কগাছ। গড়গড়ি মামা সবার জুল জুল করা চোখের সাম্নে—ফাইভ-স্টার দুলিয়ে আবৃত্তি করেন—

'ট্যুইন্‌কিল ট্যুইন্‌কিল ফাইভ-স্টার'

—হাউ আই ওয়াণ্ডার—

—হোয়াট ইউ আর।'

নাট-বলটু আর থাকতে না পেরে মামার দুই পায়ের উপর বডি থো করে দেয়,

'মামা তোমার পায়ে পড়ি মামা। একটা ফাইভ-স্টার ছাড় মামা।'

'নো, নো, আমি আইসক্রীম নই। অত সহজে গলছি না। আগে আনসার পরে ফাইভ-স্টার। নো আনসার নো স্টার।'

—বলেই মামা ঝুল পকেটের মধ্যে ফাইভ-স্টার টপাৎ করে ফেলে দিলেন।—আর তালায় চাবি দিতে দিতে বললেন,

'নাউ, ইট ইজ আণ্ডার লক অ্যাণ্ড কি।'

অগত্যা ননটাই কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল।

'বল তোমার ধাঁধা।'

মৃদু হেসে মামা শুরু করলেন,

'এক নম্বর ধাঁধা হচ্ছে, আই. ওয়াই. ডি. পি. কি ?

দুই নম্বর হচ্ছে, বিশ্বের কোন্ বিখ্যাত সুরস্রষ্টা কানে কালা ছিলেন ?

তিন নম্বর, পশ্চিমবাংলার কোন্ বিখ্যাত ভাস্কর অন্ধ ছিলেন ?'

নাট-বলটু, গোলটু; বাবুয়ার মুখ বাংলার পাঁচের মত লম্বা হতে শুরু করে।

'মামা এ যে জি, কের ডাল ?'

'তার মানে ?'

'তার মানে এ যে জেনারেল নলেজের ডাল।'

'ঠিক বলেছিস! ধাঁধা মানেই নলেজ। নলেজ মানেই ডাল —ডালে ডালে চলা আর কি! নে এবার লেখ—

চার নম্বর ধাঁধা হচ্ছে, কোন্ পা-হীন বৈমানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়—দেশ রক্ষার প্রয়োজনে বারবার স্পিট-ফায়ার বিমান চালিয়েছিলেন ?

আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে, বিশ্বের কোন্ বিখ্যাত কবি অন্ধ ছিলেন ?'

ঠিক এই সময় নাট-বলটুর মা প্লেটে প্লেটে সিঙ্গাড়া কচুরী নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

'থ্রী চিয়ার্স ফর মাদার, হিপ্, হিপ হুরে—রে—'

—নাট-বলটুর সুরে সবাই গলা মেলায়। মামাও গলা

মেলান। মামার জন্য চেয়ারের পাশে টুলের উপর সিঙ্গাড়া ও কচুরীর পাহাড় রেখে নাট-বলটুর মা ভাই গড়গড়ির জন্য চা আনতে ছুটলেন।

—নাট-বলটুর চোখে চোখে একটা ইশারা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওরা সিঙ্গাড়া-কচুরী শেষ করে জল খেতে বাইরে চলে গেল।

—নাট ফিরে এল। বলটু ছাড়া।

সবাই গোল হয়ে বসে খেতে খেতে ধাঁধার উত্তর বের করতে বসে গেল। মামাও চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে একটার পর একটা গরম গরম সিঙ্গাড়া আর কচুরীর মুণ্ডু চর্বণ করতে লাগলেন আয়েস করে। সবার অলক্ষ্যে বলটু চেয়ারের পেছনের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে, মামার চেয়ারের কাছে এল হামাগুড়ি দিয়ে। মামার জোব্বার ঝুল পকেট মাটিতে বস্তার মত ঘাড় কাৎ করে শুয়ে আছে। বলটু আম-কাটার ব্লেড দিয়ে নিঃশব্দে পকেট চিরে দিয়ে ফাঁক করল। একটার পর একটা ফাইভ-স্টার চালান করে দিল নিজের পকেটে। তারপর নিঃশব্দে বেড়ালের মত অদৃশ্য হয়ে গেল জানালার পথে। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী ছেলের মত মুখ মুছতে মুছতে সবার সঙ্গে যোগ দিল।

—'খাওয়া একটু হেভী হয়েছে। এখন আমি ধ্যান করব। সাইলেণ্ট—আমার ধ্যানভঙ্গ করলে ভস্ম করে দেব।'

—মামা তলিয়ে গেলেন ধ্যানের বঙ্গোপসাগরে। পিঁ-পিঁ-পিঁ—বাঁশির সুর বাজতে থাকল মামার নাকের ফুটোয়।

'কাঁকন তোর কটা হল?'—দাঁতন জিজ্ঞাসা করল।

'শেষের দুটো হয়েছে তোর?'

'দুই আর তিন হয়েছে। কিন্তু এক নম্বরটাই গড়বড় করছে মামার মত।'

বাবুয়া বলে, 'দেখি তোদের উত্তরগুলো।' ননটাই হঠাৎ বলে

ওঠে, 'দেখ মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব প্রশ্নই হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে। তাহলে কি···?'

নাট এবার তুড়ি মেরে বলে ওঠে, 'মার দিয়া—কেল্লা। প্রথম ধাঁধার উত্তর আমার মাথায় কামিং কামিং মানে এসে গিয়েছে।'

'কি বলনা ছাই।'—তাতন জিজ্ঞাসা করে।

'উত্তর হচ্ছে ইণ্টারন্যাশন্যাল ইয়ার অব্ ডিসএবলড পারসনস্।'

'ডবল মাদার, ডবল মাদার, জাগো। ধাঁধা সলভড্।'

—চীৎকারে মামার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

—মামা হাই তুলে বলেন, 'অত সহজ নয়, বুঝলি? বল দেখি উত্তর।'

ননটাইয়ের আর দেরি সয় না। উত্তর বলতে থাকে,

'এক নম্বর, আই. ওয়াই. ডি. পি. মানে হচ্ছে, ইণ্টারন্যাশন্যাল ইয়ার অব্ ডিসএবলড্ পারসনস্—বাংলায় যার নাম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বৎসর'।

'গুড্।'

'তুই নম্বর ধাঁধার উত্তর হচ্ছে, বিটোফেন।'

'গুড্ গুড্।'

'তিন নম্বরের উত্তর হচ্ছে—

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।'

'ভেরী গুড্।'

'চার নম্বর—উইং কমাণ্ডার ডগলাস বর্ডার।—'

'আর পাঁচ নম্বরের উত্তর হচ্ছে ইংরাজ কবি মিলটন।'

'ভেরী ভেরী গুড্!'

'শুধু ভেরী ভেরী গুড্-এ হবে না। ফাইভ-স্টার দাও।'

সবাই একযোগে কোরাস গান গেয়ে ওঠে। ছয় সাতটা হাত মামার দিকে এগিয়ে এল।

'অবশ্যই। অবশ্যই।'

গড়গড়ি মামা মৃদু মৃদু হেসে চাবি দিয়ে—পকেটের তালা খুললেন। হাত ঢোকালেন ফাইভ-স্টার বের করে আনার জন্য। কিন্তু একি, পকেটে তার হাত থ্রু পাস করে যাচ্ছে। মামা তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করে ওঠেন,

'এ্যাঃ আ-মা-র, প-প-কেট, ফাঁ-ফাঁ-কা। একেবারে চি-চিং ফাঁক। চিচিং ফাঁক।'

ধপাস্। মামা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন।

কাঁকন চিৎকার করে উঠল, 'জল, জল।'

দাঁতন দৌড়ে পাখা এনে বাতাস করতে শুরু করল।

———

ফাৎনাদার দেহত্যাগ

ফাৎনাদা, স্বনামধন্য ফাৎনাদা। আমাদের স্কুলের সব ছাত্রদের গুরু। ক্লাস এইটে এইবার নিয়ে দুবার হলটিং দিলেন, শুধুমাত্র আমাদের ধন্য করতে। এর আগে ফাইভ, সিক্স, সেভেন সব ক্লাসেই গুডস্ ট্রেনের মত হলটিং দিতে দিতে এতদুর এসেছেন। ফাৎনাদা স্কুলকে ভীষণ ভালবাসেন। তাই তিনি মায়া কাটাতে পারছেন না।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে স্যারদের নিয়ে। আমাদের গুরুর মাহাত্ম্য তাঁরা ফীলই করতে পারেন না। ঘোর কলি, ঘোর, ঘোর কলি। নইলে, তারা গুরুর আশ্রম ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্রটা টের পাওয়া গেল বৃহস্পতিবার বারবেলায়। প্রথম পিরিয়ড, ইংরেজী স্যার এসেই কথা নেই বার্তা নেই চোখের সার্চ লাইট দুটোকে পোঁ পোঁ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে হাঁক পাড়লেন,—

'ফাৎনা, হোয়ার ইজ ফাৎনা ?'

ফাৎনাদা তখন লাস্ট বেঞ্চ আলো করে, ধ্যানস্থ হয়ে বসে, সবে মাত্র উর্ধ্বলোকে যাত্রা করেছেন ; ঘোৎনা কনুই দিয়ে গুঁতো দিল গুরুকে। ফাৎনাদা চোখ খুলে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন,

'ইয়েস স্যার।'

'ঘুমুচ্ছিলে ?'

'নো, স্যার।'

'—বাড়িতে ট্রানশ্লেসন দিয়েছিলাম, করেছ ?'

'ইয়ে মানে, করেছি স্যার।' মাথা চুলকে ফাৎনাদা উত্তর দেয়। শিষ্যমণ্ডলী চমকে ওঠে! ঘোৎনা ফিস ফিস করে বলে—

—'কেলেংকুরিয়াস।'

ঝিঙে বলে—'ক্যাডাভেরাস। গুরু ঘুমের ঘোরে কি বলে রে? আজ স্যার পিঠে পেরেক ঠুকবে।'

'স্টপ টকিং।—পড় ফাংনা'।

ফাংনাদা আট নম্বর বঙ্গলিপির পাতা ওলটান। আমাদের বুকের মধ্যে দার্জিলিং মেল স্টার্ট করে,—ধকাস্, ধকাস্।

'তাহারা ট্রেন হইতে নামিল এবং জলযোগ করিল—দে গট ডাউন ট্রেন এণ্ড মেড ওয়াটার কানেকশন।'

স্যারের চোখ ছানাবড়া টু রসবড়া!

'তাহারা রসগোল্লা ও সন্‌দেশ খাইয়াছিল, দে ইটেড রসোজিরো এণ্ড ইয়ারকান্ট্রি!' ঝর ঝর করে ফাংনাদার ট্রানশ্লেসনের গাড়ি এগিয়ে চলে। ইংরাজী স্যারের চোখ অলরেডি তখন জলযোগের পানতুয়া! বেলুন যেন ফটাস্ করে ফাটল,

'স্টপ, আই সে স্টপ।'

ফাংনাদার গাড়ি ব্রেক করল। আমাদের হার্টে প্যালপিটিশন আরও বাড়ল!

সারা ক্লাস চুপ। কি হয়, কি হয়—ভাবনা! এই সময় স্যার করুণ কণ্ঠে বলেন

'বাবা ফাংনা, তুমি নমস্য। তুমি নেশফিল্‌ডের জ্যাঠামশায়। ১৯৪৭ সালের আগে জন্মাওনি কেন বাবা?'

' কেন স্যার?'

'এই ইংরেজী যদি তুমি মনুমেন্টের তলে দাঁড়িয়ে বলতে তবে ইংরেজরা বাপ বাপ ডেকে ভারত ছেড়ে পালাত। তুমি সত্যিই বিপ্লবী, ভাষা বিপ্লবী।'

'কি যে বলেন স্যার।'—ফাংনাদা লজ্জা পান।

ইংরেজী ক্লাস শেষ হল। স্যার বোলড্ আউট। গুরুর সাধনার জোর আছে বলতে হবে। প্রথম কিস্তি অভিনন্দন শেষ

হতে না হতেই—কাট্। ঢুকলেন পণ্ডিতমশায়। সেকেণ্ড পিরিয়ড শুরু হল।

পণ্ডিত মশাই নাকের মধ্যে ডাবল ডোজে নস্যি গুঁজে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। আবার আক্রমণ। দিনটা বোধ হয় অশ্লেষা মঘা।

'—ভোঃ ভোঃ শাখামৃগ ফাৎনা।'

'বলুন স্যার।'

'বলত কাকস্য পরিবেদনা মানে কি?'

'বাংলা মানে?'

'—তবেরে মর্কট, বাংলা নয় কি হিন্দী?'

'—বলছি স্যার, কাক মানে কাক, অস্য মানে অশ্ব মানে ঘোড়া, পরি মানে পড়িয়া, বেদনা মানে ব্যথা পাইল। তাহলে সম্পূর্ণ মানে হল, কাক ঘোড়া হইতে পড়িয়া ব্যথা পাইল।'

পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ দুটো স্রেফ চড়ক গাছ! শুনতে শুনতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, এবার ধপাস করে বসে পড়লেন।

এহেন গুরু ফাৎনাদা; আমাদের অকূলে ভাসিয়ে তার পরের দিন সকাল বেলায় দেহত্যাগ করলেন। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক।

সেইদিন সন্ধ্যায় পণ্ডিত মশায় আর ইংরেজী স্যারের আবির্ভাব ঘটল ফাৎনাদার বাড়িতে। নিশ্চয়ই পঞ্চমুখে ফাৎনাদার গুণকীর্তন তাঁরা করেছিলেন। তাই ফাৎনাদার বাবা কর্ণমর্দন সহযোগে ঈষৎ গুরু যষ্টিমধু প্রয়োগ করেছিলেন ফাৎনাদার পৃষ্ঠদেশে। ফলে সকালে দেখা গেল গুরু ভ্যানিশ, স্রেফ অদৃশ্য। টেবিলে এক খণ্ড কাগজ! তাতে লেখা

'—মনের দুঃখে দেহত্যাগ করলাম!'

আমরা মানে তার চেলারা, মানে পটলা, উচ্ছে, ঝিঙে, ঘোৎনা—সবাই মনের দুঃখে গুরুর দেহ খুঁজতে লাগলাম। দেহত্যাগ করলে

অন্ততঃ দেহটা ত পাওয়া যাবে। কিন্তু হা হতস্মি, গুরুর বডির কোন ট্রেসই পাওয়া গেল না। মনের দুঃখে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে বসে আমরা গুরুর বিরহে চাশোকের (চা-রূপ শোকের) সাগরে ভাসছি, এমন সময় গুরুর আবির্ভাব! একেবারে হিন্দী সিনেমার মত।

পটলার চোয়ালের জয়েন্ট খট্ করে আটকে গেল।

ফুর-র-র মুখ থেকে ঝিঙের চা ছিটকে পড়ল।

'উচ্ছে, হাঁ করে থাকিস না। চা আর ডাবল সাইজের রসোজিরোর অর্ডার দে।'—গুরুর বাণী।

'তুমি ত দেহত্যাগ…,' পটলা ঢোক গিলতে গিলতে বলে।

'চেপে যা। ওটা 'দেহ' নয় 'গৃহ' হবে। শ্লিপ অফ পেন হয়েছিল।'

'তা তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে গুরু?'

'জয়ন্তী পাহাড়ে।'

'—কেন, কেন?' আমাদের ব্যগ্র প্রশ্ন।

'ভেবেছিলাম একেবারেই বুদ্ধদেব হয়ে যাব। তাহলে ঐ ইংরেজী ফিংরেজীর ঝামেলা থাকে না।'

'কিন্তু সংস্কৃত, টংস্কৃত…,' ঝিঙে আমতা আমতা করে বলে।

'থামত বাচাল'—ঘোৎনা ধমক দেয়।

'হিন্দী, স্রেফ হিন্দী বুঝলি, তাতেই কার্যম্ খতম্'—গুরু তুড়ি মারে।

'তা, ফিরে আসলে কেন গুরু?'

'বাঘের উৎপাতে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে সবাই আমরা নড়ে চড়ে বসলাম। বুঝলাম গুরু একটা জম্পেশ ছাড়বেন।

'পাহাড়ে পৌঁছাতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা স্ট্রেট লাইন পারপেনডিকুলার গাছে চড়ে বসলাম। হঠাৎ দেখি, ওমা! আমার

পাশের ডালেই উঠে বসে আছেন একটা ভালুক মশায়! বিয়ার উঠে দাঁড়ায় সোজা।'

'ভালুক—জয়ন্তী পাহাড়ে, গাছের ডালে?'

'চুপ! শুনে যা!'—ধমক দেন গুরু।

'আমিও ভয় পাওয়ার বান্দা নয়, গর্জে উঠলাম, ফলম্ ফলে ফলানি, অহম্ অস্মাকম্ তস্য তেষু, হ্রীং খ্রীং মমারঃ। ব্যস, ধপাস্! পড়ে গেল। সংস্কৃতের ৪২০ ভোল্টেজ সহ্য করতেই পারল না।'

'তারপর বুঝি বাঘ এল?'—ঝিঙে প্রশ্ন করে।

'রাইট। ঠিক ধরেছিস। তোর হবে, লেগে থাক।'

এরপর এল বাঘ। সেকি সাইজ! একেবারে সুপার লম্বা, ডিলুকস চওড়া। হেড তো নয় যেন সাত নম্বরের প্র্যাকটিস ফুটবল। রণজিৎ সিংয়ের মত গোঁফ। হেড স্যারের গর্জন প্লাস বাবার গর্জন প্লাস পণ্ডিত মশাইয়ের গর্জন মিলিয়ে সেই বাঘের গর্জন। এক একটা লাফ দেয় আর গোঁফটা এসে লাগে আমার পায়ের তলায়। কি করি, মহা মুস্কিল। ব্যাগে ছিল আমার একটা বই। মাথার বালিশ করব বলে।'

'কি বই? সংস্কৃত?'

'না।'

'ইংরেজী গ্রামার?'

'না।'

'তবে?'

সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্যের ডিগ্রি ক্লাসের হিসাবশাস্ত্র এডিশন ১৯৮৬। ওজন ১০ কেজি ৭৫২ গ্রাম। বইটা দাদার।'

'তারপর?'

'তারপর যেই না বাঘ আবার লাফ দিয়েছে, অমনি মাথা লক্ষ্য করে বইটা ছেড়ে দিলাম। ব্যস কেল্লা ফতে। ব্যাঘ্র মহারাজ

মাটিতে পতিতং এবং সেন্সলেসং অভেবেং।'—বলেই গুরু টপাটপ সবকয়টা রসোজিরো মুখের মধ্যে চালান করে দিলেন।

সবাই হায় হায় করে উঠল। পটলা বল্ল, 'এটা কি হল গুরু ?'

"জিভে দয়া"—বলে হন হন করে গুরু ফাংনাদা তিরোধান করলেন।

কেষ্টদার অভিযান—১

তিস্তানদীর পুব পাড়ে দোমোহনী রেল স্টেশন। সেই স্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রেল কলোনী। হাইস্কুল। বাজার। হাস-পাতাল। হাইস্কুলের নাম খাতায় কলমে পলহোয়েল হাইস্কুল। তবে তাকে সবাই জানে দোমোহনী হাইস্কুল বলে।

সেই স্কুলের একদিনের ঘটনা; তখনও টিফিনের ঘণ্টা পড়তে মিনিট দশেক বাকী আছে। ক্লাস সেভেনের ছাত্র টাবলু মারাত্মক একটা সংবাদ পেল। তাদের ক্লাসের সেরা ফুটবল-প্লেয়ার সতু, যে নাকি রাইট ইনে দাঁড়ালে এ টীমের গোল-কীপারেরও মা কালীর কাছে মানত করতে হয়, সে নাকি রেলের হাসপাতালে। কাল রাতে ওরা কয়েকজন মিলে তিস্তার চরে গিয়েছিল, চুপি চুপি না বলে (চুরি নয়) কয়েকটা তরমুজ নিয়ে আসতে।

একে বৈশাখ মাস, তাতে কয়েকদিন ভীষণ গরম চলছে। তরমুজের পিপাসা তো ওদের পেতেই পারে। কিন্তু ছেদী মাহাতো অ্যাণ্ড পার্টি ভীষণ হৃদয়হীন। রাতের অন্ধকারে লাঠি হাতে শেয়াল তাড়াবার মতো মাইল খানেক তাড়িয়ে এনেও যখন হাতেনাতে ধরতে পারল না তখন ফ্যাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে সতুকে। সতুর মাথাটা প্রায় এক ইঞ্চির মতো কেটে গিয়েছে। কিন্তু বি-টীমের সেরা প্লেয়ার বলে কথা! তাই ফাটা মাথা নিয়ে ফুল স্পীডে বাড়ির গেট পর্যন্ত কভার করেছে। সে যাই হোক, ছেদী অ্যাণ্ড পার্টির বড় বাড় বেড়েছে। ওদের ঠাণ্ডা করতেই হবে। সতু তাই ওর বন্ধু বেজীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে টাবলুর কাছে।

টাবলু ক্লাস সেভেনের সর্দার। কিন্তু ওর গুরু হচ্ছে ক্লাস এইটের কেষ্টদা। কেষ্টদা হোস্টেলে থাকে। ওর অনেক চ্যালাচামুণ্ডা।

সারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই কেষ্টদার ভক্ত। স্কুলের বি-টীমের গোল-কীপার! লিকলিকে চেহারা। ঘন শ্যামবর্ণ রঙ। বেজায় হাসি খুশি। ভাল আবৃত্তি করে। অভিনয়ে তো জুড়ি মেলা ভার।

মাস্টার মশায়রা বলেন, 'কেষ্টার মাথাটা তোদের সবার চাইতে ভাল। কিন্তু ও মাথাটাকে কেবল নষ্টামি-ফষ্টামির কাজে লাগায়!' স্কুলের বড় ক্লাসের ছাত্ররাও কেষ্টদাকে সমীহ করে চলে। এমনকি ইংরেজীর মাস্টারমশায় অতীনবাবুও কেষ্টদাকে তাঁর ছেলের চাইতে বেশী ভালবাসেন। বিপদে আপদে সকলকেই কেষ্টদার শরণ নিতে হয়।

ক্লাসটা অফ্। মাস্টারমশায় আসেন নি। টাবলু পকেট থেকে ব্যাঙ বের করে নিয়ে বিশুকে ইশারা করল। ও আর বিশু জলের কলের দিকে যেতে যেতে ব্যাঙটা মাঝে মাঝে বাজাতে থাকল। টিপ্ টিপ্ টিপ্। সিকস্, সেভেন আর এইটের ছাত্রদের মধ্যে ইশারা ছড়িয়ে পড়ল। টিফিন পিরিয়ডে তেঁতুলগাছতলায় ওদের জরুরী মিটিং ডাকা হচ্ছে।

টিফিনের পর। ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। কেষ্টদা ভার নিয়েছে। বলেছে, "ছেদী মাহাতো অ্যাণ্ড কোং-কে আমি শাস্তি দেবই। সতুর মাথা ফাটানোর বদলা আমি নেবই। তোরা সবাই পেটপুরে তরমুজ খাবার জন্য তৈরী থাক্। তোরা কোন হৈ চৈ করবি না। কেউ নাম বলবি না। মা কালীর দিব্যি—মা সরস্বতীর তিন দিব্যি।" সব ছাত্র একসুরে বলেছে—"মা কালীর দিব্যি—মা সরস্বতীর তিন দিব্যি।"

অনেক রাত। হোস্টেলের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিভু, কেষ্টদার একনম্বর সেনাপতি, জানালার শিকের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে এসে

একটা আমগাছের গোড়ায় দাঁড়াল। তারপর কুবো পাখির মতো মুখে হাত দিয়ে ডেকে উঠল কুব, কুব, কুব্। থেমে থেমে আবার ডাকল, কুব্—কুব্—কুব্। হোস্টেলের আরও কয়েকটা রুমের জানালা খুলে গেল। তা দিয়ে নেমে এল আরো দশজন ছাত্র। সবার পরনে ফুটবল খেলার কালো হাফ প্যাণ্ট। খালি গা। মুখে ভুসো কালি। কেষ্টদার কোমরে একটা ছয় ইঞ্চি ফলার চাকু। তারা সার বেঁধে রেললাইন পার হয়ে হাঁটতে লাগল। বিভুর হাতের ছোট টর্চ মাঝে মাঝে খানাখন্দগুলো ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিতে লাগল। কেষ্টদা শুধুমাত্র ফিস্‌ফিস্ করে সবাইকে প্ল্যান বুঝিয়ে দিতে দিতে চলল। সবাই এসে থামল নদীর পাড়ে। বিকেলবেলায় বিভু এখানে একটা বড় ছিপ্‌নৌকো বেঁধে রেখে গিয়েছিল। বারজন ঠাসাঠাসি করে বসার পর বিভু আর কেষ্টদা নৌকা লগি দিয়ে নিঃশব্দে তিস্তার উপর এগিয়ে চলল। ওরা বুদ্ধি করে তরমুজ ক্ষেতের পেছন দিকে চলেছে। কেননা, ওরা জানে ছেদীর দলবল চরের সামনের দিক আগলে রাখে। হাঁটাপথেই তরমুজ চোরেরা আসে। নদীপথে পেছনদিক দিয়ে আসা ছেলেছোকরাদের বুকের পাটা হবে না! একে নদীর পাড়েই আছে শ্মশান। যেখানে দিনের বেলাতেই লোকজন আসতে ভয় পায়, তারপর শূয়োর ও বাঘের উপদ্রব আছে, নদীর ছোট ছোট চরের নলখাগড়ার বনে।

ছিপ এসে থামল শ্মশানঘাটের কাছে বড় এক নিমগাছের তলায়। কেষ্টদা তার দলবল নিয়ে বুকে হেঁটে এইবার গুড়ি মেরে এগিয়ে চলল তরমুজ ক্ষেতের দিকে। বিভু বেজীর পিঠে বেঁধে দিয়েছিল দুটো বস্তা। ওরা সোজা বুকে হেঁটে নিঃশব্দে ঢুকে গেল ক্ষেতের মধ্যে। কেষ্টদা বলছিল, যেখানে দেখবি গোল গোল বালুর ঢিপি আর কাঠিপোঁতা, বুঝবি ঐগুলোই সেরা মাল। কাল পরশু টাউনে পাঠাবার জন্য নিশানা করেছে। ঐগুলোই আমাদের টারগেট। পলটু আর বেজী পটাপট তরমুজ বস্তার

মধ্যে ভরতে লাগল। একটা ভরতি হতেই দড়ি দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল। এই করেই চারটি বস্তাই ভরা আর বাঁধা হয়ে গেল।

কেষ্টদা ঠিকই বলেছিল, বস্তাগুলো বেজায় ভারী হয়েছে। তরমুজ তো না, যেন আট-নম্বর ফুটবল। ট্যাপা আর মানিক গাছের গোড়া কাটতে শুরু করেছে। তবে কেষ্টদার নির্দেশ আছে, বেশী গাছ আর বেশী ফল নষ্ট করা চলবে না। নিমগাছতলা থেকে শেয়াল ডেকে উঠল—"ক্যা - হুয়া—ক্যা - হুয়া।" কিছুক্ষণ পরে ছেদীদের ছাপড়া ছাড়িয়ে একটু দূরে শেয়ালরা মানে কেষ্টদারা উত্তর দিল, "হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।" অর্থাৎ এবার তোমাদের কাজ শেষ। তোমরা নৌকায় উঠে পড়। আমাদের খেল দেখিয়ে আমরা আসছি। বেজী, ট্যাপা, মানিক ও পল্টু চরের উপর দিয়ে বস্তা টেনে নিয়ে চলল। কেষ্টদা, বিভু ততক্ষণ পরে নিয়েছে ম্যাজিক দেখাবার কালো জামা। কঙ্কাল আঁকা তাতে। ওরা নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, যেখানে ছেদী আর তার পাহারাদাররা আগুন জ্বেলে গাঁজার কলকেয় টান দিচ্ছিল। বিভু কঙ্কালের মতো সাদা হাতখানা বাড়িয়ে দিল ছেদীর দিকে আর বলল, "ছেদী, মুঁঝে ভী এক ছিঁলিম দেঁও।"

কেষ্টদা লাফিয়ে পড়ল মাঝে, "নাঁ নাঁ—নাঁ, আঁমাকে দাঁও, আঁমাকে দাঁও।" বলে নাচতে লাগল ধেই ধেই করে। ছেদীর হাত থেকে কোলের ওপর খসে পড়ল গাঁজার কলকে। পাহারা-দারদের একজন "হায় রামজী, হায় রামজী"—বলতে বলতে সোজা চরের সামনের দিকে দৌড়াতে থাকল। তার দেখাদেখি আর সকলেই—"রাম-রাম-রাম" করতে করতে তার পিছু নিল! ভূত দুটো ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ছেদীরা জানত না সামনেই কেষ্টদার দলবল বালি সরিয়ে রেখেছে। 'ঝপাস—ঝপাস' করে চারজনই লম্বা টানা গর্তের মধ্যে উল্টে পড়ল অন্ধকারের মধ্যে। তখন কেষ্টদা আর বিভু গর্তের পাশে রাখা চোতরা (বিছুটি)

পাতার ডালগুলো দিয়ে আচ্ছা করে ওদের খোলা পিঠে, বুকে আর মুখে পিটাতে লাগল। ছেদীর দলবল তখন একহাতে গা চুলকায় আরেক হাতে মার ঠেকায়। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আবার শোনা গেল—"হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া হুয়া হুয়া।" অর্থাৎ "হয়েছে হয়েছে এবার চলো।" অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ মিলিয়ে গেল দুটো ভূত।

পরদিন সারা দোমোহনী রেলকলোনীতে হৈ চৈ। তিস্তার চরে কাল রাতে দুটো ভূত ছেদীদের উপর চড়াও হয়েছিল। ওদের সারা গা ফুলে ঢোল। এখন পর্যন্ত ওরা—"রাম রাম রাম" নাম করছে।

ছাত্রমহলে খুশির ঢেউ বয়ে গেল। রটে গেল এটা কেষ্টদার কেরামতি!

কেষ্টদার অভিযান—২

আর একটা ঘটনা বলি শোন। তখন পৌষমাস শেষ হয় হয়। সেই সময় স্কুলের হোস্টেলে দেখা গেল বেজী, বিভু, লঙ্কা, গাবলু পাঁচ নম্বর ঘরে খাটের উপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ওদের মনে চিন্তা, ব্যাপারটা কি ? সুপারের অফিসঘরে হরিদা বঙ্কুদা ঢুকল ত ঢুকলই। ফিরে আসার নাম করছে না। অথচ এদিকে ওদের উত্তেজনার থার্মোমিটারের পারা চড়তে চড়তে ডেন্‌জার লেভেল ক্রশ করে যাচ্ছে। যে কোন সময় ওরা একের পর এক সেন্সলেস হয়ে পড়ে যেতে পারে সেদিকে হরিদাদের খেয়াল নেই।

বেজী আর থাকতে না পেরে বিভুকে বলে, 'বিভু, আমার বুকের মধ্যে রেলইঞ্জিন ভীষণ ভাবে চলছে। আর পারছি না।'

বিভু বলল, 'চেপে যা ব্রাদার, সবারই একই অবস্থা। ধৈর্যং ধরু।' বিপদের সময় বিভুর কণ্ঠ থেকে সংস্কৃতের বুলেট ছোটে। হেড পণ্ডিত পর্যন্ত যে বুলেটে মাঝে মাঝে আহত হন।

ওদের পাশের খাটে শুয়ে ধীরু সিলিং-এর কড়িকাঠ গুনছিল। মনে মনে তাকে দুই দিয়ে গুণ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার দুই ভাগ দিচ্ছিল যাতে জোড় সংখ্যা হয়, আর হরিদা ভাল খবর নিয়ে আসে। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল বিভুর বুলেট মার্কা সংস্কৃত বাণীর 'ধরু' শব্দটা শুনে। লাফিয়ে উঠল বিছানার ওপরে। আর তেড়ে গিয়ে বলল, 'ভাল হবে না বিভু, আমাকে সংস্কৃতে গালাগালি ? না হয় তুই সংস্কৃতে পনেরই পাস। আর আমি না হয় তেরই পাই। তাই বলে সংস্কৃতে জেনারেল নলেজ একেবারে কম নয়।—তুই একটা ফাস্ট ক্লাশং ইডিয়টং।'

বিভু হাত জোড় করে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে, '—হে বন্ধু, চটিতং ফাটিতং কেন অকথ্যং ভাষিতং ? আমি ত ধরু বলেছি। ধীরু বলি নি। তুমি একটি লম্বকর্ণ…'

'কি, কি বললি ?'

ঝগড়া হয়তো আরও কিছুদূর গড়াতো। কিন্তু এই সময় হরিদা ঘরে প্রবেশ করল। মুখখানা তার বাংলার পাঁচের মতো হয়ে আছে। সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

'কি হল ? কি হল ? হরিদা'

হরিদা ধপাস্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হোল না। পারমিশন হোল না। পৌষ পার্বণে কারও বাড়ি যাওয়া হবে না। দেখ, যদি বা সুপার প্রকাশবাবু একটু নরম হয়েছিলেন। কিন্তু ঘরে বসেছিলেন অঙ্কের মাস্টারমশায় বিপদভঞ্জন-বাবু এবং হেড পণ্ডিত নকুল বাবু। তারাই একস্বরে বললেন, 'নাহে প্রকাশ, ওদের পড়ার ক্ষতি হবে।'

'পড়ার ক্ষতি হবে।' মুখ ভেংচে ধীরু সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়।

বেজী, লঙ্কা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'তাহলে কি হবে, হরিদা ? বাড়িতে সবাই পুলি-পিঠে, কাঁচি-পিঠে, পাটিসাপ্টা খাবে, আর আমরা এখানে সেই কুমড়োর ঘ্যাঁট গিলবো।'

'না, আমরাও পিঠে পায়েস খাব।' কেষ্টদা হাসতে হাসতে পাঁচ নম্বর রুমে প্রবেশ করল।

দুষ্টু বুদ্ধি আর সাহসে কেষ্টদার জুড়ি সারা দোমোহনীতেই পাওয়া ভার। ভক্ত ছাত্রদের নিয়ে কেষ্টদার একটা দল আছে যারা রাত্রে এ বাড়ির ও বাড়ির ডাব, শশা, কলা, বাতাবী লেবু সব কিছু মাঝে মাঝেই ফর্সা করে দেয়। এমন কি তিস্তার চরের তরমুজ, লিচু বাগানের লিচু কিছুই কেষ্টদার সাঙ্গপাঙ্গদের হাত

থেকে রেহাই পায় না। এই দলের সেনাপতি বিভু। দলের মূল ঘাঁটি হচ্ছে হোস্টেল।

এই কেষ্টদার অভয়বাণী শুনে সবাই বাড়ি যেতে না পারার ব্যথা এক মুহূর্তে ভুলে গেল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল 'হুররা।'

হোস্টেলের দারোয়ান গোলাপবাগ। হোস্টেল থেকে একটু দূরে রেলের কোয়ার্টারে থাকে সস্ত্রীক। ওদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। তাই গোলাপবাগের বউ হোস্টেলের ছাত্রদের ভীষণ স্নেহ করে। আবার ছাত্রদের মধ্যে কেষ্টদার প্রতি বুড়ীর স্নেহটা বেশী। ছাত্ররা এই পারশিয়ালটিতে ক্ষোভ প্রকাশ করলে, বুড়ী জানকী ফোকলা দাঁতে হেসে বলে, 'আগের জনমে ও আমার লাল ছিল।'

কেষ্টদা তার বুড়ীমার সঙ্গে সারা বিকাল যেন কি কি ফিসফাস করে পরামর্শ করল। গোলাপবাগ সব দেখে মুচকি হেসে বলল, 'মালুম হচ্ছে আজ রাতে কারও সর্বনাশ হবে। তোদের জন্মে হামার নোকরী না যায়।'

কেষ্টদা হেসে বলল, 'চাচা, নোকরি গেলেও তোমার ভয় নেই। রেশনের আতপচাল, চিনি, সুজি বিক্রী করে তোমার যা ইনকাম তাতে বুড়োবুড়ীর বেশ চলে যাবে। এবার কিন্তু চাচা, তোমাকে আমাদের পৌষ পার্বণে চাল আর চিনি চাঁদা দিতে হবে।' 'হায় রাম!' আঁতকে ওঠে গোলাপবাগ।

বুড়ী আগ বাড়িয়ে বলে, 'তুই ভাবিস না বেটা। হামি সব ঠিক করিয়া দিব। তুই এবার হোস্টেল যা।' কেষ্টদা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাত। সারা দোমোহনী ঘুমিয়ে পড়েছে। পৌষের কনকনে শীত। তার সঙ্গে তিস্তার হাওয়া। ফলে ঠাণ্ডা যেন সূঁচের মতো বিঁধছে। একটা কুকুর পর্যন্ত ঘরের বাইরে নেই। নিঝুম

রাত। শুধু জোনাকিরা—নালার পাশে ঝোপে ঝোপে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। কালো অন্ধকারের স্রোতে যেন ভেসে চলেছে হাজার হাজার নীল আলোর প্রদীপ।

কেষ্টদা আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের শীতের গ্রাহ্য নেই। মুখ, কান সবার মাঙ্কি ক্যাপ দিয়ে ঢাকা। বিভুর হাতে একটা বড় বালতি। বেজী ও ধীরুর হাতে দুটো ছোট বালতি। কেষ্টদা ওদের নিয়ে প্রথমেই ঢোকে প্রকাশবাবুর গরুর গোয়ালে। তারপর শুরু হয় দুধ দোয়ানো। বেজী দুধ দোয়ানো শেষ করে ফিস ফিস করে বলে—'কাজ খতম।'

কেষ্টদা তখন গরুর দড়ি খুলে দিল। ধীরু সামনে কাঁঠাল গাছের ডাল ধরল। আর পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল গরু আর বাছুর সমেত হেড পণ্ডিত নকুল বাবুর গোয়ালঘরের দিকে। এখানে দুধ দোয়াতে বেশী দেরি হল না। প্রকাশবাবুর গরুকে নকুলবাবুর গোয়ালে রেখে নকুলবাবুর গরুকে ওরা একই কায়দায় নিয়ে চলল বিপদভঞ্জনবাবুর গোয়ালের দিকে। বিপদভঞ্জনবাবুর মুলতানী গাই দোয়াতে একটু বেশী সময় লাগল। কিন্তু লাভ হল অনেক বেশী। বড় বালতি ভর্তি হয়ে গেল। এইবার বড় বালতিতে বাঁশ ঢুকিয়ে দুজনে মিলে কাঁধে করে ওরা ছুটে চলল গোলাপবাগের বাড়ির দিকে।

দরজায় টোকা দিতেই বুড়ীমা ওদের জন্য দরজা খুলে দিল। ওরা অবাক হয়ে দেখল বুড়ীমা কয়লার উনান জ্বালিয়ে চাল চিনি নিয়ে রেডি হয়ে আছে। বুড়ীমা কেষ্টদাকে বলল, 'বেটা দুধটা কড়াইতে ঢেলে দিয়ে, বালতি নিয়ে পালা। ঘরকে গিয়ে ঘুম লাগা। কাল সকালে বহুত হুজ্জৎ হবে। ওরা বুঝতে পারল, বুড়ীমা ঠিকই বলেছে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় গিয়ে ঘুমিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সকাল হতেই দেখা গেল, প্রকাশবাবু তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে প্রায় উড়ে আসছেন হোস্টেলের দিকে। হাঁটার তালে তালে তাঁর বিশাল ভুঁড়িটা তিস্তার ঢেউয়ের মতো নাচছে। বিভু জানালা দিয়ে নজর রেখেছিল কখন আসেন প্রকাশবাবু তা জানার জন্য। প্রকাশবাবুর আগমন-দৃশ্য নজরে পড়তেই বিভু মুরগীর ডাক ডেকে উঠল, 'কঁকর কোঁ, কঁকর কোঁ।' অর্থাৎ হুঁশিয়ার, রাগে রক্তিম সুপার প্রকাশবাবু প্রকাশিত হচ্ছেন হোস্টেলের আকাশে। সারা হোস্টেলে একসাথে শুরু হল পড়ার ধুম। সবাই একেবারে ভেরি ভেরি লক্ষ্মী ছেলে। কোন ঘর থেকে ভেসে আসতে থাকল 'নরঃ, নরৌ, নরাঃ।' কোন ঘর থেকে শোনা গেল, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর ; এ নহে মোর প্রার্থনা'···'Long Long ago there was a selfish giant।'

সেলফিশ জায়েন্ট কিন্তু হোস্টেলে ঢুকেই পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। যার অর্থ সবাই রোল কলের লাইনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও। হুড়মুড় করে সব ছাত্ররা সারবন্দী হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল বারান্দায়। মুখে বোকা বোকা ভাব থাকলেও সবার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলতে লাগল ধ্বক্ ধ্বক্ করে। প্রকাশবাবু রাজ্যপালের গার্ড অফ অনার নেওয়ার ভঙ্গিতে একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লাইনটা পরিদর্শন করে এলেন। তারপরে ছুটে এসে দাঁড়ালেন বিভুর সামনে। পিলে চমকানো কড়া এক ধমক দিয়ে বললেন, 'বিভু, কাল রাত্রে কোথায় তুমি ছিলে ?'

বিভু বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে প্রকাশবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রকাশবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় খুলে যাওয়া কাছা কোমরে গুঁজে নিয়ে আরও জোরে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল কোথায় তুমি ছিলে ?'

'কেন স্যার ? আমি ত হোস্টেলেই ছিলাম স্যার।'

'না, তুমি আর নাটের গুরু কেষ্টদা মিলে কালকে আমার গরুর গোয়ালে ছিলে। বল আমার গরু কোথায়? রাতচৌকিদার ভগৎলাল তোমাদের দেখেছে। এর পরেও তোমরা অস্বীকার করবে?'

বিভুর হার্টের প্যালপিটেশন বন্ধ হবার যোগাড়। তিন নম্বর বেতটার দিকে তাকিয়ে ওর বুকটা শির শির করে ওঠে।

হঠাৎ কেষ্টদা লাইন থেকে বলে ওঠে, 'না স্যার, আমি কোথাও যাই নি। ভগৎলাল কেন কোন লালই আমাকে দেখতে পারে না। আর স্যার ভগৎলাল কাল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। ওর বাড়ির চাবি আমার কাছে আছে।'

প্রকাশবাবুর মুখের উপর যেন কেউ চড় কষিয়ে দিয়েছে। বিভু, ধীরু, বেজীর বুকে সাহস ফিরে আসে। সাবাস এই না হলে গুরু! জয় গুরু, জয় গুরু!

প্রকাশবাবু এবার তার চাল বদলালেন। ধীর পায়ে এগিয়ে এগিয়ে গেলেন হোস্টেলের সব চাইতে রোগা পটকা নিরীহ ছেলে সুধীরের দিকে। ওকে লাইন থেকে বের করে নিয়ে সামনে দাঁড় করালেন।

'তোমাকে আমি হোস্টেল থেকে বের করে দেব। যদি না তুমি বল যে কে কে কাল রাত্রে হোস্টেল থেকে বাইরে গিয়েছিল।' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন প্রকাশবাবু।

কেষ্টদা জানত, প্রকাশবাবু সুধীরকে টারগেট করতে পারেন। তাই তাকে শেখানো ছিল কি কি করতে হবে বিপদে পড়লে। সুধীর দ্বিতীয়বার ধমক খেতেই ভ্যা করে কেঁদে ফেলল। প্রকাশবাবু যত ধমক দেন আর বলেন, 'এই এই কান্নার কি হয়েছে? কান্না থামা' সুধীর তত জোর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে।

কেষ্টদা তখন লাইন ছেড়ে বেরিয়ে সুধীরের হাত ধরে বলে, 'এই

সুধীর থাম্, তোর শরীর খারাপ করবে যে।' অর্থাৎ তুই অজ্ঞান হয়ে যা। ব্যস্ সুধীর ঠাস করে বারান্দায় লুটিয়ে পড়ল কাটা কলা গাছের মতো। প্রকাশবাবুর মুখ কালো হয়ে উঠল ভয়ে। সবাই তখন চিৎকার জুড়ল, 'এই জল জল, পাখা পাখা, বাতাস বাতাস কর। এই ডাক্তারবাবুকে ডাক। না না হেড মাস্টারমশায়কে সংবাদ দে।'

প্রকাশবাবুর তখন ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া। বোধ হয় তার চাকরি গেল! পল হোয়েল সাহেব শুনলে কি আস্ত রাখবে?

বিপদভঞ্জন বাবু নকুলবাবুও ছুটে এসেছিলেন প্রকাশবাবুর হাত দিয়ে ছেলেগুলিকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতি গ্রহণ করলেন। ছাত্ররা সুধীরকে কোলে করে ছুটল হাসপাতালে। এদিকে প্রকাশবাবুর ব্লাড প্রেশারের মিটার বেড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে তিনি অফিসঘরে গিয়ে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। আর কেষ্টদার হাত ধরে বলতে লাগলেন, 'কেষ্ট, তুই সাক্ষী আমি ওর গায়ে হাত দিই নি। হেডমাস্টার মশায় আর সাহেব জিজ্ঞেস করলে তুই সাক্ষী দিস। কেমন দিবিতো?'

কেষ্টদা গম্ভীর হয়ে বলে, 'স্যার আপনি এখন বিশ্রাম করুন তো! সব ঠিক হয়ে যাবে। এই বেজী স্যারকে বাতাস কর।'

বেজী শশব্যস্ত হয়ে শীতের দিনেও জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।

* * *

সেইদিন রাত্রে, হোস্টেলে বিরাট ভোজ। গেটে কিন্তু মনিটার চিত্ত তালা মেরে দিয়েছে। বাইরে পাহারা আছে গোলাপবাগ। সব ছাত্ররা কলাপাতা ঠোঙা করে নিয়ে বসে গেছে। জানকী বুড়ী হাসতে হাসতে পায়েস বিলি করছে সবাইকে। বুড়ী আবার সারাদিন

ভরে পাটিসাপ্টা বানিয়েছে ছেলেদের জন্য। বুড়ী এক এক জনকে দিতে দিতে, সুধীরের পালা আসতেই সবার দিকে তাকিয়ে বলল 'এ ব্যাটারা, হামি সুধীরকে দুবাটি পায়েস খিলাবো। ও যা নাটক করল —তার জবাব নাই।'

হরিদা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।' সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি থামতেই সুধীর হঠাৎ বলে উঠল, 'কেষ্টদা!' সবাই তখন একযোগে বলে উঠল, 'যুগ যুগ জিও।'

———

হীরা-মোতি

ভোরের আবির-রঙ-রোদ, থির থির করে কাঁপছে গাছের পাতায় পাতায়। আবছা আবছা আঁধার লুকোচুরি খেলছে আম বাগান, জাম বাগানের ফাঁকে ফাঁকে। কোচবিহার শহরের বর্ধিষ্ণু পাড়া পাটাকুড়ার এখনও ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু ঘুম ভেঙেছে মোতির। তার দাদা হীরা ওরফে হীরক অঘোরে ঘুমে আচ্ছন্ন।

'দাদাভাই, সোনাভাই, ওঠ—প্র্যাকটিসে যাবি না — ?'

মোতি তার ঘুমন্ত দাদাকে ঠেলতে থাকে।

'হুঁ, যাব। আর পাঁচ মিনিট পরে ডাকিস।'—হীরা পাশ ফিরে কোল বালিশ জড়িয়ে আবার ঘুমের সাগরে তলিয়ে যায়।

বোন মোতি ছাড়ার পাত্রী নয়। ও জানে দাদার এটা আলসেমী। পরে ঘুম থেকে উঠেই বলবে, 'তুই গুড্ ফর নাথিং। জানিস ত আমি ঘুমের কিং মানে বাদশা। আমি ত অমন বলবই। তোর ডিউটি হচ্ছে আমাকে ঠেলে উঠিয়ে দেওয়া। না উঠলে ঠেলে খাট থেকে ফেলে দিবি।'

'দাদামণি, ওঠ না, বেলা যে বেড়ে যাচ্ছে'—মোতি জোরে ধাক্কা দেয়।

'না! তোর জ্বালায় পারা গেল না। মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়ি, তোকে এবার বাড়ি থেকে দূর করে দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে।'—রাগে গজগজ করতে করতে হীরা খাট থেকে নামে। গামছা দড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে কলপাড়ে ছোটে।

'ইস, তাইত, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'—ঝড়ের গতিতে হাত মুখ ধুয়ে, প্যান্ট, গেঞ্জী, বুট সব ব্যাগে ভরে হীরা—

এবার হাত বাড়ায়।

'কই হরলিকস দে। কই—'

মোতির দিক থেকে কোন সাড়া নেই। ঘরের হুপাশে হুটো খাট। মাঝখানে পড়ার টেবিল। সামনে একটা চেয়ার। কাঠের। মোতি টেবিলের উপর ঝুঁকে বইয়ের মধ্যে মুখ গুজে বসে আছে। চোখ ছল ছল। ঠোঁট তুটো থির থির করে কাঁপছে।

হীরা বুঝতে পারে ওর আদরের বোন ব্যথা পেয়েছে। খেলার মাঠের তুরন্ত উইং ছোট্ট বোনটার কাছে একেবারে তুর্বল। সবার কাছে হীরা একগুঁয়ে—ডানপিটে। কিন্তু বোনের চোখের জল ও সহ্য করতে পারে না। মোতিও দাদা অন্ত প্রাণ।

গুটি গুটি পায়ে হীরা বোনের কাছে এগিয়ে আসে।

'কি হয়েছে লক্ষ্মী বোনটি ?'

কোন উত্তর নেই। হীরা বোনের চিবুকটা জোর করে তুলে ধরে। 'একি তুই কাঁদছিস ? এই-এই মোতি, কাঁদিস না, কাঁদিস না তুই। জানিস ত আমি তোর চোখের জল দেখতে পারি না।'

কথা বলতে বলতে হীরার গলা ধরে আসে। ওর চোখে নেমে আসে ঝরঝর করে চোখের জল।

'কেন তুই আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিবি বললি ? আমি কি মুখপুড়ি ?'

'দূর পাগলী, ও ত কথার কথা। তুই না থাকলে আমার চলে ? তুই ত আমার লাইন অফ্ ডিফেন্স। জার্সি কাচা, বুটের পালিশ, মাকে ম্যানেজ এসব তুই না থাকলে কে করবে ? এই এই মোতি, একটু হাস না—লক্ষ্মী বোনটি আমার।'

'উ—' জিব ভেঙিয়ে হেসে ফেলে মোতি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাদার গলা জড়িয়ে ধরে। আর বলে—'দাদাভাই, এবার প্র্যাকটিসে যাও। তাড়াতাড়ি না ফিরলে মাকে ম্যানেজ করা ভীষণ

মুস্কিল হবে। হীরা বোনের কপালে ছোট্ট একটা আদর ছুঁইয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

মোতি স্বগত বলে 'আস্ত পাগল দাদা একটা।'

*　　　*　　　*

'আসুক আজ বাড়িতে, ওর ঠ্যাং আমি বাড়িয়ে ভাঙ্গব। আমি সারাদিন খেটে খেটে মরব, আর নবাব পুত্তুর গায়ে ফুঁ দিয়ে খেলে বেড়াবেন? পড়া নেই, শুনো নেই, শুধু খেলা আর খেলা। এক ক্লাসে বছর বছর লাড্ডা। যেমন বাপ তেমন পুত্তুর।'

সন্ধ্যেবেলা। হীরার মা রান্না ঘরে তরকারি কোটেন আর আপন মনে ছেলের আর ছেলের বাবার মুণ্ডুপাত করতে থাকেন। এককালে কোচবিহার মহারাজার ফুটবল টীমের নামকরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিশোরীবাবু। খেলার নেশায় লেখাপড়া বেশীদূর করতে পারেন নি। জীবনের ধ্যান জ্ঞান ছিল ফুটবল আর ফুটবল। তারপর একদিন ঢাকা উয়াড়ীর সঙ্গে খেলতে গিয়ে পায়ের সিনবোন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কিশোরীবাবুর সব স্বপ্নও তখন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল ভাঙ্গা কাঁচের মত। অনেক চিকিৎসা হল। জলের মত টাকা ব্যয় হল। সকলের সাহায্যে, নিজের জমান টাকা সব নিঃশেষ করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেন পঙ্গু কিশোরীবাবু। আজ তিনি ওষুধের দোকানের খোঁড়া কর্মচারী। কোন মতে সংসার চলে। দেনার দায়ে সংসার ডুবে আছে। হীরার মা বিড়ি বেঁধে, কাগজের ঠোঙ্গা বানিয়ে, এবাড়ি ওবাড়িতে উৎসব পার্বণে নানা কাজ করে, প্রাণপণে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য উদয়াস্ত খেটে চলেছেন। তার একমাত্র স্বপ্ন ছিল হীরা একটার পর একটা পরীক্ষায় পাশ করবে, পাশ করে চাকরি করবে। কিন্তু তা হবার নয়। রক্তে ওর

খেলার নেশা। হীরাও জানে তার মায়ের স্বপ্নের কথা। চেষ্টাও করেছে মাঠের ত্রিসীমানা না মাড়াতে। কিন্তু বিকেল হলেই ঐ গোল গোল চামড়ার বলটা যেন তাকে চুম্বকের মত টানতে থাকে। পায়ের পেশীগুলো কিসের উত্তেজনায় যেন আকুলি বিকুলি করতে থাকে। পারে না থাকতে। ছুটে যায় মাঠে।

'গুষ্টির ধারা যাবে কোথায়? মরবে, মরবে, খেলার মাঠেই মরবে।'

পড়ার ঘর থেকে মোতি আর্তনাদ করে ওঠে, 'মা! মা!' চমকে ওঠেন হীরার মা। ছুটে যান পড়ার ঘরে।

'কি হয়েছে? কি হয়েছে?'

'মা, মাগো, ভর সন্ধ্যেবেলায় তুমি অমন কু-ডাক ডেকো না।'

'ওরে আমার দাদা সোহাগী। তোরা আমার সব শত্তুর। সব শত্তুর। তোদের বাপ জ্বালিয়েছে। তোর দাদা জ্বালাচ্ছে। তুইও জ্বালাবি।' হীরার মায়ের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। তাইনা দেখে মোতি মার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর বলে,

'না মা, আমি তোমাকে কোনদিন জ্বালাব না। বল, আমি কোনদিন তোমার অবাধ্য হয়েছি? দেখ আমি নিশ্চয়ই ডিস্ট্রিকট্-এর মধ্যে মাধ্যমিকে প্রথম হয়ে তোমার মাথা উঁচু করে দেব।'

দয়াময়ীর চোখের জল এবার তোরষা নদীর বন্যার মত নেমে আসে বাঁধনহারা।

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দয়াময়ী বলেন, 'জানিরে জানি মোতি, তুই আমার একধারে লক্ষ্মী আরেকধারে সরস্বতী। কিন্তু তোরও শরীর যে একদম ভাল না। একটা পাগল মাঠে মাঠে ছুটে বেড়ায়। কেন জানি না আমার ভয় করে। ভীষণ ভয় করে।

তাইত তোদের বকি। আচ্ছা পাগলী, তুই তোর হরলিকস হীরাকে খাওয়াস কেন?'

'মা, দাদা যে ভীষণ পরিশ্রম করে। ওর যে ডিম, দুধ, মাছ কত কিছু খাওয়া দরকার। আমরা ত ওকে কিছু দিতে পারি না। যদি দাদার সাংঘাতিক কিছু…'

'থাক, থাক ও কথা মুখে আনিস না।' দয়াময়ী মেয়ের মুখ চেপে ধরেন নিজের বুকের মধ্যে, ঝড়ের রাতে ভয় পাওয়া পাখি-মায়ের মত।

'বেশ, বেশ, বেশ। আমার জন্য লাঠির বাড়ি, মেয়ের জন্য ক্ষীরের হাঁড়ি।' ঘরের কোণে খেলার ব্যাগ ও বুট নামিয়ে রাখতে রাখতে হীরা ফোড়ন কাটে। তারপর মোতির দিকে তাকিয়ে বলে, 'কিরে বুড়োধাড়ি মেয়ে, মার বুকের মধ্যে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলি কেন? মা, বুঝি আমাকে না পেয়ে তোকেই উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিয়েছে?'

'থাম্, রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে মাতব্বরি করতে হবে না। এখন, হাত পা ধুয়ে মুখে কিছু দিয়ে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার কর।'—দয়াময়ী চোখের জল আড়াল করার জন্য তাড়াতাড়ি রান্নার ঘরে পা বাড়ান।

'মা, যা পার তাড়াতাড়ি দাও। স্নান বৈরাগীদীঘিতে সেরে এসেছি। পেটের মধ্যে বাইশটা প্লেয়ার আপ এণ্ড ডাউন গেম দিচ্ছে।'

মোতি চোখের জল মুছে বলে, 'দে ভেজা জামা প্যান্টগুলো, বারান্দায় মেলে দিয়ে আসি। নইলে কাল শুকাবে না।'

'ও সোনা বোন, হাসত দেখি,'—

'আমার হাসার সময় নেই। কাল আমার টারমিন্যাল পরীক্ষা।'

'সে যে আমার আদরের ছোট বোন', গান করতে করতে হাসি হাসি মুখে এবার হীরা লাল রিবনে বাঁধা রূপোর উপর সোনার

কাজ করা মেডেল প্যান্টের পকেট থেকে বের করেই ঝট্ করে মোতির গলায় পরিয়ে দেয়।

'দাদা, দাদা—তুই—তুই সোনার মেডেল পেয়েছিস ?'

মোতির মুখ চাঁদের মত ঝিলমিল করে ওঠে।

'মা—মা—মা—এদিকে এস !'

'কি হ'ল ?'

'এস না, ছুটে এস।—দেখ।'

দয়াময়ী ভয় পেয়ে ছুটে আসেন। এমন কি, দোকান ফেরতা কিশোরীবাবুও তাড়াতাড়ি গেট খুলে পড়িমরি করে ক্র্যাচ-পায়ে দৌড়ে আসেন। 'কি হোল, কি হোল ?'

'দেখ, দেখ, দাদা আজ কি সুন্দর মেডেল পেয়েছে !'

দয়াময়ী ও কিশোরীবাবুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। ওরাও তাকিয়ে দেখেন, লণ্ঠনের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে সোনার মেডেল।

হীরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্রথমে মাকে প্রণাম করে। তারপর বাবাকে প্রণাম করে উঠতেই কিশোরীবাবু ছেলেকে তার চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতির মধ্যে জড়িয়ে ধরেন,···

'তোকে আরো আরো বড় হতে হবে হীরা। আমার ভেঙ্গে যাওয়া স্বপ্ন তোকে···'

কথা শেষ করতে পারেন না—কিশোরীবাবু। ঘরের বাতিটা দপ দপ করে উঠে নিভে যায়। জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জোৎস্নার আলো। শ্রাবণের বাতাসে ভেসে আসে বকুল ফুলের গন্ধ।

*　　　*　　　*

সকালবেলা। গম্ভীর মুখে মোতি দাদার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

'দাদা আজ কিন্তু দুপুরে বাইরে যাবি না।'

'আমার যে আজ খেলা আছে!'

'সে ত বিকেলে।'

'বন্ধু বলেছে ওদের বাড়িতে খেতে।'

'মাসিমাকে আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই আজ ওদের বাড়ি খাবি না।'

'না-না, তা হয় না।'

'দাদা।'

অভিমানী বোনের মুখভার। চোখ ছল ছল করে ওঠে। হীরা তাই না দেখে তাড়াতাড়ি বলে,

'বেশ বাবা, বেশ। আজ দুপুরে আমি কোথাও যাচ্ছি না। বাড়ির ঘ্যাঁট গিলবো আর কড়িকাঠ গুনব। হল ত?'

'দাদা আমার সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহাই খায়। কোন দিকে নাহি চায়।'

'ভাগ!'—তাড়া দেয় হীরা! মোতি হাসতে হাসতে দৌড়ে পালায়।

দুপুরবেলা। পিঁড়িতে বসে আছে হীরা। উসখুস করছে। কেন যে মোতি এত দেরি করছে? খিদেতে নাড়ি-ভুড়ি হজম হয়ে যাবার যোগাড়। মোতি এবার মুচকি হেসে ভাতের থালায় তরকারি ডাল, মাছের বাটি সাজিয়ে অন্নপূর্ণার মত উদয় হয়। নীচু হয়ে পাতের পাশে একটার পর একটা সাজিয়ে রাখে। হীরা খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। তারপর চোখ বড় বড় করে বাটি গুনতে গুনতে বলে, 'ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর, আরি ব্যস কেলেংকুরিয়াস। ব্যাপার কি!' 'ব্যাপার যাই হোক, খবরদার এখন ভাতে হাত দিও না। আগে মা আসুক'। দয়াময়ী ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মুখে ছড়ান রয়েছে ভোরের মত মিষ্টি

হাসি। সদ্য স্নান করেছেন। চুলের আগায় চিক্‌চিক্‌ করছে জলের কণা। কপালে টক্‌টকে লাল সিঁদুরের টিপ। পরনে লাল পাড় শাড়ি। হীরা একদৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয় স্বয়ং মা দুর্গা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতের থালায় ধানদূর্বা আর চন্দন। মোতি দাদার সামনে পায়েসের বাটি নামিয়ে দিয়ে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে গাল ফুলিয়ে শাঁখে ফু দেয়। নিস্তব্ধ দুপুরের বাতাস গম গম করে ওঠে শাখের মিষ্টি সুরে।

'আজ তোর জন্মদিন হীরা। আমি কিচ্ছু জানি না, সব আয়োজন মোতি পাগলীর।'

'পাগলী কি আর গাছে ফলে মা?'

মোতি এবার দৌড়ে ঘরে চ'লে যায়। বেরিয়ে আসে সুন্দর রঙ্গীন সিলোফেন কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট নিয়ে। তারপর দাদাকে প্রণাম করে এগিয়ে দেয়, 'দাদামণি, তোমার জন্মদিনে মোতি পাগলীর উপহার।'

'কি আছে এর ভেতরে?'

'বলব না। নিজে খুলে দেখ।'

হীরার আর তর সয় না। প্যাকেট খুলে ফেলে। প্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসে কালো চক্‌চকে দামী একজোড়া নতুন বুট। অলিম্পিক বুট।

'বুট! অলিম্পিক বুট। তুই আমাকে বুট দিলি'! পিঁড়ি ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। মোতিকে এক ঝটকায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে নাচতে থাকে হীরা।

'দারুণ, দারুণ,.. ....'

হঠাৎ হীরার উচ্ছ্বাস থেমে যায়। 'কিন্তু এত টাকা পেলি কি করে?'

'তা দিয়ে তোর দরকার কি ?'

'ঠিক !'

মোতি ওর জেদী দাদাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। আর ঘাটাতে সাহস করে না—। বলে,

'ভাল রেজাল্টের জন্য স্কুল আমার সব মাইনে মকুব করে দিয়েছে। আগে যত মাইনে দিয়েছিলাম সব রিফাণ্ড হয়ে গেল। তাই দিয়ে তোর বুটও হোল। বিজনদা তোর পায়ের মাপ জানেন। উনিই এনে দিয়েছেন কলকাতা থেকে।'

দয়াময়ী এতক্ষণ নীরব দর্শকের মত ভাইবোনের পাগলামি দেখছিলেন। এবার তিনি ওদের দুজনকে তাড়া দিলেন—

'এবারে তোরা নাচানাচি বন্ধ কর তো। দুজনে কিছু মুখে দে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে।....'

মোতিও একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে দাদার পাশে বসে যায়। কর্মক্লান্ত কিশোরীবাবু ক্র্যাচটাকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখতে রাখতে বলেন, 'কি ব্যাপার! জন্মদিনটা কার—মোতির, না হীরার ?'

দয়াময়ী মোড়াটা আগিয়ে দিয়ে বাতাস করতে থাকেন কিশোরী-বাবুকে। হীরা-মোতির কথা বলার অবকাশ নেই।

* * * *

অলবেঙ্গল ইণ্টার ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল টুর্ণামেণ্ট। ফাইন্যালে উঠেছে কোচবিহার জেলার স্কুল একাদশ। সবার মুখে একটি নাম—'হীরা'—'হীরা'। পাঁচটি খেলায় মোট বারটি গোলের দশটি গোলই দিয়েছে হীরা। ফাইন্যালে খেলা হুগলী স্কুল একাদশ বনাম কোচবিহার স্কুল একাদশ। হুগলী স্কুল একাদশ শক্তিশালী দল। পশ্চিম বাংলার জুনিয়র ফুটবল টীমে খেলে এমন চারজন খেলোয়াড় রয়েছে ওদের দলে। এ হেন শক্তিশালী দলকে

কোচবিহার স্কুল একাদশ রুখে দিয়েছে প্রথম দিনের খেলায় ১-১ গোলে। হুগলী জেলার চীনের প্রাচীর ভেদ করে হীরাই গোল দিয়েছে, চোখ জুড়ান গোল।

আজ দ্বিতীয় বারের ফাইন্যাল। শেষ ফাইন্যাল। দুইদলই মরীয়া হয়ে মাঠে নামছে। আজ কিশোরীবাবু ও মোতি দুইজনেই মাঠে এসেছেন গেস্ট কার্ডে। স্টেডিয়ামে শুধু মানুষ। মানুষের সমুদ্র। কোচবিহার স্কুল টীমের কোচ ভোলাবাবু সবাইকে শেষ নির্দেশ দিচ্ছেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ, টাউন হাই, জেনকিংস স্কুলের হেডমাস্টার মশাই সব খেলোয়াড়দের পিঠে হাত দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'তোমাদের হাতে আজ কোচবিহার জেলার মান ইজ্জৎ। আমাদের জিত্‌তে হবে, এই ভেবে লড়বে।'

হেডমাস্টার তরুণবাবু বুকের মধ্যে টেনে নিলেন হীরাকে। আর বললেন,—'হীরা, আজ গোল চাই। মাঠে ঝড় বইয়ে দাও। হীরা মাস্টারমশায়কে প্রণাম করে দৌড়ে চলে গেল বাবার কাছে। বাবাকে প্রণাম করে, মোতিকে মুখ ভেংচি দিয়ে দলের মধ্যে চলে এল। সারা স্টেডিয়াম চীৎকারে ফেটে পড়ল, 'হীরা, গোল চাই। গোল চাই।' সারা মাঠের দর্শকের স্নায়ু টান টান হয়ে উঠল। দুই দলই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমান্তরাল রেখার মত। প্রধান অতিথি শৈলেন মান্নাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে এগিয়ে চলেছেন ক্রীড়া জগতের প্রবাদপুরুষ শৈলেন মান্না। তিনি থমকে দাঁড়ালেন হীরার কাছে এসে। বাড়িয়ে দেওয়া হাত হীরা না ধরে মাঠের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের উপর নামিয়ে দিল মাথা। বৃদ্ধ শৈলেন মান্না অভিভূত হয়ে পড়লেন। বুকের মধ্যে টেনে নিলেন কালো ছিপছিপে ছেলেটাকে। সারামাঠ আর একবার উল্লাসে ফেটে পড়ল।

কিশোরীবাবুর চোখের কোণে জমে উঠল শ্রাবণের জল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললেন—'সাবাস।'

বেজে উঠল বাঁশী। বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মত আছড়ে পড়ল হুগলী কোচবিহারের রক্ষণভাগের উপর। দর্শকদের গলার কাছে কিছু যেন দলার মত আটকে গেল। গোলকিপার নিতাই দর্শনীয় ভাবে গোল বাঁচাল। বল উঠে এল সেন্টার লাইনে। আবার হুগলীর লেফট উইং তীরের মত কোচবিহারের রক্ষণভাগ ছিন্নভিন্ন করে ঢুকে পড়ল পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। কেউ কিছু বোঝার আগেই বল ঠেলে দিল তার পেছনে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা ফরওয়ার্ডকে। বার কাঁপান শট। বারের কোণায় লেগে বল জড়িয়ে গেল গোলপোস্টের জালে। হুগলীর খেলোয়াড়রা গোলদাতা ফরওয়ার্ডকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে নৃত্য করে নিল একচোট।

কোচবিহারের ক্ষুদে সাপোর্টাররা চীৎকার করে উঠল, "দাঁড়ান দাদা, দাঁড়ান, খেল ত সবে শুরু।'

আবার সেন্টার হল। হীরা বল নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল। শুরু হল চীৎকার—'ব্যাক্ আপ ব্যাক্ আপ হীরা।' হুগলীর তিনজন প্লেয়ার ঘিরে ধরল হীরাকে বেড়াজালের মত। প্রথমেই চার্জ করল হুগলীর মারকুট্টে স্টপার। হীরা ডানদিকে বেরিয়ে যাবার জন্য ঝোঁক দিল আর বলটা ওর দুপায়ের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে সাঁ করে শরীরকে অদ্ভুত কৌশলে বাঁ দিকে ফিরিয়ে এনে, বাঁ দিক দিয়ে স্প্রীংয়ের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল। ফুলস্পীডে তেড়ে আসা আরও দুই প্লেয়ার প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল স্টপারের সঙ্গে। সারা স্টেডিয়াম ফেটে পড়ল হাসিতে।

হীরার পায়ে বল আঠার মত। হুগলীর সব প্লেয়ার মরীয়া হয়ে আটকাতে চাচ্ছে। সবার নজর হীরার দিকে। ফাঁকায় দাঁড়িয়ে

থাকা ছোটনকে কেউই ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। হীরা সেই সুযোগ নিল। বল চট করে ঠেলে দিল ছোটনের দিকে আর চীৎকার করে উঠল, 'কিক্ টু গোল।' ছোটনও বিদ্যুৎগতিতে বল পাঠিয়ে দিল গোলের দিকে। 'গোল—গোল—গোল ল—'! স্টেডিয়াম ফেটে পড়ল চীৎকারে। মাঠ জুড়ে শুরু হল নৃত্য। ছুটল পুলিশ।

কিশোরীবাবু মোতিকে বল্লেন 'দেখলি ত, একেই বলে জাত প্লেয়ার। ঠিক সময় ঠিক কাজ করা।'

'গোলের সব ক্রেডিট কিন্তু দাদার।'

'সে আর বলতে।'

হাফ টাইম হল। সারা মাঠে উত্তেজনা। দর্শকদের স্নায়ু টন টন করছে।

খেলা আরম্ভের বাঁশী বাজল। রাগে ফুঁসছে হুগলীর স্টপার। প্রচণ্ড গতিবেগ। একবার বল কোচবিহারের সীমানায়। পর মুহূর্তেই বল ছুটছে হুগলীর গোল সীমানায়। দুই দল মরীয়া হয়ে উঠেছে। হীরা যেন মাঠে দশটা। উপরে, নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে সব জায়গায় হীরা কভার করে খেলছে। বিপক্ষদলের সব চাইতে মুস্কিল হয়েছে হীরাকে ধরে রাখা। ও বল ধরলেই সবার মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে, সুতরাং হুগলী দলের চেষ্টা হচ্ছে হীরাকে মেরে বসিয়ে দেওয়া। কয়েকবার মারাত্মক চার্জ করা হয়েছে। ক্ষেপে উঠেছে স্টেডিয়াম। কিশোরীবাবুর বুক বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে। সব ঘটনা যেন উয়াড়ীর সঙ্গে মহারাজা টীমের খেলার মত ঘটছে। তবে কি আজও সর্বনাশ হতে চলেছে? আবার প্রচণ্ড চীৎকার, হীরা বল নিয়ে ছুটছে। কিশোরীবাবু তাকিয়ে দেখেন, হরিণের মত এঁকেবেঁকে ছুটছে হীরা। ছুটে এল দুজন ডিফেণ্ডার, হীরা বলটাকে লব করে

তুজন ডিফেণ্ডারের মাথার উপর দিয়ে পার করে দিল। ডান পাশে ঘুরে গিয়ে আবার বল ধরে ছুটতে লাগল। উঠে এল স্টপার। হীরা বুঝতে পারল ওর উদ্দেশ্য ভাল নয়। কাছাকাছি আসার আগেই লেফট আউটের তুরূহতম কোণে স্বপনকে বল ঠেলে দিয়ে নিজে ডানদিকে সরে গিয়ে মারাত্মক চার্জ এড়াল। সবাইকে অবাক করে স্বপন সেন্টার করল। হাওয়ায় ভেসে আসছে বল। বল যেখানে পড়বে সেখানে কোচবিহারের কোন প্লেয়ার নেই। দর্শকরা কপাল চাপড়াচ্ছে। এমন সুন্দর সেণ্টার।

হুগলীর রক্ষণভাগও নিশ্চিন্ত। কিন্তু একি, বুলেটের মত ছুটে বেরিয়ে গেল হীরা। ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে। তারপর অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল, হরিণের মত শূন্যে লাফিয়ে উঠে হীরা সমস্ত শরীরটা সমান্তরালে ভাসিয়ে দিয়ে ছুটন্ত বলকে প্রচণ্ড কিক্ করে ঢুকিয়ে দিল গোলপোস্টের মধ্যে। রেফারী, প্লেয়ার, দর্শক কেউ কিছু বোঝার আগেই বল জড়িয়ে গেল জালে।

এক, তুই, তিন, কয়েক সেকেণ্ড থম্ মেরে রইল সারা স্টেডিয়াম। তারপর উল্লাস, প্রচণ্ড উল্লাস। বোমা ফাটতে লাগল। গাড়ির হর্ন বাজতে লাগল। কে বা কারা কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ একসাথে বাজাতে থাকল। 'গোল-গোল'।

কিশোরীবাবু ভুলে গেলেন যে তিনি ক্র্যাচ ছাড়া হাঁটতে পারেন না। উত্তেজনায় তুহাত তুলে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উলটে পড়লেন মোতির তুহাতের মধ্যে।

হঠাৎ মাঠের সমস্ত উল্লাস থেমে গেল। ওকি! সবাই পাঁজাকোলা করে হীরাকে বাইরে আনছে কেন? কিশোরীবাবু কাঁপতে থাকেন। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে? হীরা! হীরা!'—আর্তনাদ করে ওঠেন কিশোরীবাবু।

* * *

হাসপাতালের কেবিন। নিথর হয়ে শুয়ে আছে হীরা। সংজ্ঞাহীন। তবে শরীরে খিঁচুনী কমেছে। ডাক্তাররা বলছেন, 'হয়ত অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং টেনশনের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা কাটলে তবে বোঝা যাবে।'

দাদার শিয়রে জেগে আছে মোতি। ভোলাবাবু ও কিশোরীবাবু অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিলেন, তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে।

শুধু জেগে আছে মোতি, দাদার কপালে হাত রেখে। মাঝে মাঝে প্রার্থনা করছে 'জয় বাবা মদনমোহন, জয় মদনমোহন, আমার দাদাভাইকে ভাল করে দাও, আর কিছু চাই না। আর কিচ্ছু চাই না।' টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল বিছানার উপর ঝরে পড়ে।

ভোরের আবির-রঙ আলো কাঁচের জানলায় ঝিলমিল করে ওঠে। জানলাটা মোতি খুলে দেয়। এক ঝলক ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায় কেবিনের মধ্যে দিয়ে। চমকে ওঠে মোতি। দাদার চোখের পাতা যেন কাঁপছে। ঐ ত, দাদা একবার চোখ খুলে তাকাল। আবার চোখ বন্ধ করল। মোতি ঝুঁকে পড়ল দাদার মুখের উপর। সত্যি কি না দেখবার জন্য। এবার হীরা সম্পূর্ণ চোখটা খুলল। তারপর চোখ দুটো কেবিনের চারপাশে ঘুরতে থাকল। অনেকক্ষণ ভ্রূটা কুঁচকে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। মোতির বুক ভয়ে, আনন্দে, উত্তেজনায় ধক্ ধক্ করতে থাকে। কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'বাবা, বাবা, দাদার জ্ঞান ফিরেছে।' দাদার হাত দুটো মুঠোর মধ্যে নিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, 'দাদাভাই, দাদাভাই, কথা বল কথা বল, আমি, আমি, মোতি। তোর পাগলী...' হীরা অস্ফুট স্বরে ডাকে, 'মোতি—মোতি!' ঠিক এই সময়

ঢুকলেন শৈলেন মান্না, ডক্টর ভাওয়াল ও ডক্টর বোস। হাসতে হাসতে বললেন 'হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার।'

কিশোরীবাবু কাঁদছেন ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে। ভোলাবাবু ছুটলেন দয়াময়ীকে শুভ সংবাদ জানাবার জন্য। অবশ্যই তিনি মদনমোহন বাড়ি হয়ে যাবেন।

———

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা

হুগলী জেলার ছোট্ট এক গ্রাম,—দেবানন্দপুর। সেই গ্রামের ছোট্ট একটা ছেলে; মাথাভর্তি চুল। তবু নাম তার 'ন্যাড়া'।

নাম তার ন্যাড়া, কিন্তু দুষ্টুমিতে সে সবার বাড়া। গ্রামের ছোট্ট ছোট্ট ডানপিটেদের সর্দার সে। গ্রামে আছে পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালা। এই পাঠশালার ছাত্র ন্যাড়া। বেশী পড়তে ভাল লাগে না তার। ভাল লাগে গাছে উঠতে। নদীতে ঝাঁপাতে। মাঠে মাঠে খেলতে। বন বাদাড়ে ফড়িংয়ের পিছু পিছু ছুটতে।

একদিন বড়সড় একটা ফড়িং ধরল ন্যাড়া। সুতো দিয়ে বাঁধল তার পা। তারপর কি মজা, কি মজা; ফড়িংটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, সুতোর টানে বেশী দূর যেতে পারে না। ঠিক যেন ঘুড়ি উড়ছে। এমনি করে চলে মজার খেলা। হঠাৎ ন্যাড়ার মনে হল, 'আহা রে, ফড়িংটার কত না কষ্ট হচ্ছে। কতক্ষণ ও ওর মা বাবাকে দেখেনি'। যেই একথা মনে হওয়া, ওমনি ন্যাড়া ওর বাঁধন খুলে দিল। ন্যাড়া দুষ্টু ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিল না।

তখনকার দিনে সব পণ্ডিতের পাঠশালাতেই একজন করে সর্দার-পড়ুয়া থাকত। ন্যাড়াদের পাঠশালাতেও ছিল। নাম ছিল ট্যাঁপা। ন্যাড়ার সঙ্গে ট্যাঁপার সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায় বা বলা যেতে পারে, দা-কুড়ুলের সম্পর্ক। ফলে পিয়ারী পণ্ডিতের বেত প্রায়ই পড়ত ন্যাড়ার পিঠে হরির লুটের বাতাসার মত।

ন্যাড়াও তাই ছিল তাকে তাকে। একদিন দুপুর বেলা। পাঠশালার ছাত্ররা সুর করে নামতা পড়ছে। পণ্ডিতমশাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। ট্যাঁপাও সুযোগ বুঝে একটু ঝিমুচ্ছে। পাশেই ছিল চুনের গাদা। ন্যাড়া চুপি চুপি পড়া ছেড়ে উঠে গেল ট্যাঁপার পেছনে। তারপর এক ধাক্কা। ব্যস—ট্যাঁপা সটান গিয়ে পড়ল চুনের গাদায়, মুখ থুবড়ে। মুখে-চোখে, গালে চুন; ভূতের মত চেহারা। হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠল ট্যাঁপা।

ঘুম ভেঙ্গে গেল পণ্ডিত মশাইয়ের। গর্জে উঠলেন তিনি, 'কি হয়েছে রে?'

ন্যাড়ার এক শাকরেদ কাশীনাথ। মুখ কাঁচু মাচু করে বল্ল, 'পণ্ডিতমশাই, ট্যাঁপাদা না ঝিমুচ্ছিল। ঝিমাতে ঝিমাতে চুনের গাদায় পড়ে গিয়েছে।'

ব্যস, আর যায় কোথায়? চাকা ঘুরে গেল। শুরু হল বেতের বর্ষণ, সর্দার পড়ুয়ার পিঠে। এমনি দুষ্টু ছিল ন্যাড়া।

ন্যাড়ার বাবার নাম ছিল মোতিলাল। মার নাম ছিল ভুবনমোহিনী। ন্যাড়ার মামার বাড়ি ছিল ভাগলপুর। তারা সবাই মিলে এল ভাগলপুর। বিরাট বড় বাড়ি। অনেক লোকজন। প্রথম প্রথম গ্রামের জন্য তার ভীষণ মন খারাপ লাগত। কিন্তু এখানেও বন্ধু জুটতে তার দেরি হল না। সমবয়সী মামা আর মামাতো ভাইয়ের বিরাট এক দল, তাদের সর্দার হয়ে বসল ন্যাড়া কিছুদিনের মধ্যে।

কি মুস্কিল। এখানেও তাকে ভর্তি হতে হ'ল দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে। এর মাস্টার অক্ষয় পণ্ডিত। ইয়া উঁচু লম্বা; ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল; লম্বা দাড়ি। সব মিলিয়ে সাংঘাতিক চেহারা অক্ষয় পণ্ডিতের। তার চড়? ওরে বাব্বা! কল্পনা করতেও ন্যাড়ার বুক কেঁপে ওঠে। অন্য সব ছাত্রদের অবস্থা

তথৈবচ। সবাই তখন সর্দার ন্যাড়াকে ধরে পড়ল, 'ভাই ন্যাড়া, একটা বুদ্ধি বের কর।' ন্যাড়া অনেক ভেবেচিন্তে পরামর্শ দেয়, 'মন্তর চাই, মন্তর দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের হাত অবশ ক'রে দিতে হবে।' শুরু হল মন্তর খোঁজা। অনেক খুঁজে ন্যাড়া-ই এক মন্তর বের করল, 'ওং হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।' সবাই খুশী। ভীষণ খুশী। জোরাল একটা মন্তর পাওয়া গেছে।···মন্তরের গুণে কিনা বোঝা গেল না, তবে ন্যাড়া কিন্তু বেশ ভালভাবেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করল।

এবার তাকে ভর্তি হতে হল তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে। এই সময় ন্যাড়ার দৌরাত্ম্য বাড়ল বই কমল না। নিত্য নতুন দুষ্টু বুদ্ধি তার মাথা থেকে বের হতে থাকল।

তখন বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ন্যাড়া তার দলের কাছে সগর্বে ঘোষণা করল 'শিকার করতে হবে।'

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করল, 'কি দিয়ে?'

'বন্দুক দিয়ে।'

'বন্দুক কোথায়?'—'কেন, তৈরী করব।' 'কি দিয়ে?' 'কেন বাঁশ দিয়ে?' এর জন্য পাকা বাঁশ চাই। মহা উৎসাহে ন্যাড়ার শিষ্যরা বেরিয়ে পড়ল পাকা বাঁশের খোঁজে। পাওয়া গেল পাকা বাঁশ। ন্যাড়াও বাঁশের মধ্যে বারুদ ঠুসে বানিয়ে ফেলল অদ্ভুত বন্দুক। বন্দুক ত হল। এবার! এবার শিকার কোথায়? বন্ধুরা বলল, 'চল কুকুর মারি। একটা পাগলা কুকুর আছে।'

কুকুরের প্রতি ন্যাড়ার আবার ভীষণ মায়া। সুতরাং ন্যাড়ার আদেশ হল, 'না, কুকুর নয়। বেড়াল ধরে আন। বেড়ালই মারা হবে।'

দলপতির নির্দেশে দেবেন গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে আনল এক বেড়াল। ন্যাড়া এবার বন্দুক বাগিয়ে ধরে বলল, 'দেবেন, তুই দড়ি ধরে বেড়ালটিকে ঝুলিয়ে রাখ, আমি বন্দুক ছুড়ি।'

দেবেনের ত কাজ শেষ। কেঁদে ফেলে আর কি! যদি তার গায়ে গুলি লাগে? অথচ দলপতির হুকুম অমান্য করার উপায় নেই। অগত্যা দেবেন চোখ বন্ধ করে, শক্তিশালী মন্তর মনে মনে পড়তে থাকে, 'ওং হ্রীং হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।' সব বন্ধুরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, কি হয়, কি হয়? ন্যাড়া বন্দুক ছুড়ল। 'ধুপ'—একটা আওয়াজ। বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়ায় একাকার। ধোঁয়া সরতেই দেখা গেল কোথায় বেড়াল? বেড়াল পালিয়েছে। এক দিকে দেবেন আর এক দিকে ন্যাড়া চিৎপটাং।

এমনি দুষ্টুমির মধ্যে দিয়ে বেশ সময় কাটছিল। কিন্তু একদিন হল কি? ন্যাড়া বনবাদাড়ে তার পোষা কোকিলের জন্য ওষুধ খুঁজছে, এমন সময় দাদুর দারোয়ান 'মুশাই' এসে হাজির। 'এ ন্যাড়া বাবু, বাড়ি চোলো; বোড়া বাবু বোলায়াছেন।' শুনেই ন্যাড়ার বুক ধড়াস্ করে উঠল। নিশ্চয়ই কেউ তার নামে লাগিয়েছে।

অগত্যা ন্যাড়া বাড়ির দিকে ফিরল। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেই দেখল বৈঠকখানায় বসে আছেন তার দাদু কেদারনাথ আর তাদের স্কুলের হেডমাস্টার-মশায়। ন্যাড়ার ত কাজ শেষ। না জানি আজ কি আছে কপালে? ন্যাড়া প্রাণপণে মন্ত্র পড়ছে, 'ওঁং হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা—স্বাহা—স্বাহা।' বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ন্যাড়া কাছে এসে দাঁড়াল।

দাদু গম্ভীর গলায় বল্লেন, 'মাস্টার মশায়কে প্রণাম কর।' ন্যাড়া প্রণাম করল। দাদুকেও প্রণাম করল। দাদু কেদারনাথ এবার ন্যাড়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। আর বল্লেন, 'বেঁচে থাক দাদু, বেঁচে থাক। তুমি এবার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ। তুমি এবার ক্লাসে ডবল প্রমোশন পেয়েছ।'

ন্যাড়ার মনে হল তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল

এই ন্যাড়া কে জান? এই ন্যাড়াই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যার কলম থেকে আমরা পেয়েছি 'ইন্দ্রনাথের' মত দুরন্ত কিশোরকে, 'রামের' মত স্নেহ-কাঙাল ডানপিটেকে, 'লেজকাটা' 'বহুরূপী', 'মেজদা' আর 'শহুরে নোতুন দা'কে।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে

কুষ্টিয়ার কয়াগ্রাম। ছবির মত সুন্দর গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে পদ্মার শাখানদী গড়াই কুল কুল করে বয়ে চলেছে। বর্ষায় দুরন্ত-সর্বনাশা। বুকে তার অথৈ জল। তীব্র স্রোত। এখানে ওখানে মরণ-ফাঁদ ঘূর্ণিপাক।

সেই গড়াই নদীতে হাসতে হাসতে পাঁচ বছরের এক ছোট ছেলেকে মা সাঁতার শেখাচ্ছেন। পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের কয়েকজন বুড়ি আর মহিলা। তারা ত কাণ্ডকারখানা দেখে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠছে। একজন বুড়ি আর থাকতে না পেরে বলে ওঠে,

'এই শরৎ, তোকে কি ভূতে পেয়েছে ? কচি ছেলেটা যদি ভেসে যায় ?'

শরৎশশী ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন,

'না মাসিমা, ভেসে যাবে কেন ? আমি ত আছি।'

'ছেলেটাও ত ভয় পেতে পারে ?'

'কিরে তোর ভয় করে ?'

'না, মা—তুমি থাকতে ভয় কি ?'

'জানিনে বাপু, জন্মে এমন কাণ্ড দেখিনি। যেমন দস্যি বাপমরা ছেলে, তেমনি হয়েছে মা।'

গজ গজ করতে করতে বুড়ি নদীর ঘাট ছেড়ে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াল। সঙ্গে চলল মেয়ে বৌরা।

এ ত গেল পাঁচ বছর বয়েসের কথা। তখন ছেলেটা ছয় কি সাত বৎসরের। ছেলেটার বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা। ঐ রাস্তা গিয়েছে গ্রাম পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে দূর শহরে। বাড়ির কাছে রাস্তার ধারে একটা বেলগাছ। বেলগাছের তলায় ছেলেটা বন্ধুদের নিয়ে খেলছিল। হঠাৎ হল কি? একটা কুকুর, কথা নেই বার্তা নেই ছেলেটাকে তাড়া করল। ছেলেটাও ভয় পেয়ে গেল। দৌড়-দৌড়—এক দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ার দিকে ছুটল। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ছেলেটির মা শরৎশশী। তিনি গর্জে উঠলেন, 'খবরদার, খোকা পালাবি না। এই নে লাঠি, তাড়া কর কুকুরকে।'

যেমন আদেশ তেমন কাজ। ছোট্ট ছেলেটাও মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। মার হাত থেকে লাঠি টেনে নিয়ে বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়াল। গর্জে উঠল, 'আয় দেখি আয়?'

কুকুরও চালাক। বুঝতে পারল ব্যাপার স্যাপার ভালো না এগিয়ে গেলে ফল ভালো হবে না। সুতরাং যঃ পলায়তি সঃ জীবতি, লেজ গুটিয়ে পালাল।

মা তখন ছেলেকে কাছে ডেকে নিলেন আর বললেন, 'দেখলি ত, রুখে দাঁড়ালে কুকুর শায়েস্তা হয়। জীবনে ভয় পাবি না। অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াবি, কেমন?'

মা কা বেটা।

ছেলেটিও উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই দাঁড়াব। আর ভয় পাব না।'

দিন যায়। বছর যায়। ছেলেটি আরও বড় হয়। প্রায় কৈশোরের সীমা ছুঁই ছুঁই বয়স।

বাড়ির সামনের রাস্তায় রোজ সকালে বেজে উঠত ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দ। কুষ্ঠিয়া থেকে আসত ডাক-হরকরা। কাঁধে ডাকের ঝোলা। ডান হাতে সড়কি। সড়কির বাঁটে বাঁধা ঘুঙুর।

চলার তালে তালে বেজে উঠত ঐ ঘুঙুর, ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্। বাজনা এসে থামত ঠিক ঐ বেল গাছটার নীচে। ঝোলা নামিয়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঠিক করে নিয়ে, কপালে বাঁধা গামছা দিয়ে ঘাম মুছে হাঁক দিত ডাক-হরকরা, 'মা জননী গো, একটু জল—তেষ্টার জল দিবেন গো?'

ছোট্ট কিশোরটি ও হাঁক শুনেই জল আর বাতাসা নিয়ে ছুটত। জল খেতে খেতে রাজ্যের গল্প শুরু হোত তার সঙ্গে। অনেক দিন থেকেই কিশোরটির মনে কতগুলো প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছিল। তাই একটু কিন্তু কিন্তু করে কিশোরটি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা তোমার ভয় করে না, রাতের অন্ধকারে ছুটতে?'

'কিসের ভয় গো খোকাবাবু?'

'কেন, পথে কত বন-শুয়োর, ডাকাত, আরও কত কি আছে?

'হাতে আমার সড়কি আছেনি—একদম ফুঁড়ে দেব না! আমার ছাতি দেখ ত খোকাবাবু। ডাকাত ফাকাত অত সহজে পার পাবেনি।'

বিস্ময়ে লোহার মত পেটা শরীরের দিকে খোকাবাবু তাকিয়ে থাকত। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করত—'যদি বিন্দী পাড়ার ঘাটে ভূত পেত্নী ধরে? ভূতের সঙ্গে ত লড়াই চলে না।'

'হো—হো—হো—হেসে ওঠে ডাক-হরকরা। ফুলে ফুলে ওঠে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। তারপর হাসি থামিয়ে বলে, 'দুর দুর, খোকাবাবু, ওসব কিচ্ছু নেই। সব গপ্পো, সবাই মিছে ভয় দেখায়।' এবার যাই গো খোকাবাবু, আবার দেখা হবেনি।'

ঝুম্, ঝুম্, ঝুম্ ঘুঙুরের শব্দ পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল. কিন্তু কিশোরের মনের জগতে বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেল। কানে বাজতে লাগল··· 'ওসব কিচ্ছু নেই। সব গপ্পো। সবাই মিছে

ভয় দেখায়। ওসব কিচ্ছু নেই...... সব গপ্পো।......সব গপ্পো।

দামাল কিশোর মনে মনে ঠিক করল নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কয়েকদিন পর। বিকাল বেলা। কিশোরটি খেলাধূলা শেষ করে বাড়ি ফিরল। হাত মুখ ধুয়ে নিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। সারা গ্রাম নিঝুম হয়ে এলো। উঠোনে তুলসীতলায় মা জ্বেলে দিলেন সন্ধ্যার প্রদীপ। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ভেসে এল শঙ্খের একটানা সুর। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ ডাক গ্রামের নিঝুমতাকে আরও ভারী করে তুলতে লাগল। এই সময় ঐ দামাল কিশোর মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে খোকা, কিছু বলবি ?'

'হ্যাঁ মা।'

'কি বলবি বল ?'

'মা, আমি এখন বিন্দীপাড়ার ঘাটে যাব ?'

'কিজন্যে যাবি ? ওখানে ত শ্মশান !'

'ঐ শ্মশানেই যাব। দেখব, ভূতপেত্নী সত্যি কিছু আছে নাকি ?'

যেমন ছেলে, তেমন মা।

'পারবি একলা যেতে ? ভয় করবে না ? কাউকে সঙ্গে নিবি ?'

'না মা ; একলাই যাব। ভয় করবে কেন ? তুমি আমার মাথা ছুঁয়ে দাও।'

'বেশ তবে যা। তাড়াতাড়ি আসিস।' শরৎশশী মৃদু হেসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

ছেলেও তেমনি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আর কি? কোন ভূতের বাপের সাধ্যি আছে কিছু করে! দূর দূর ও সব গপ্পো।

ঘন অন্ধকার। পথ নির্জন। পাড়া শেষ হল। পড়ল মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়ে ভয়হীন দামাল কিশোর আপনমনে হেঁটে চলেছে। জোনাকিগুলো টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। নীল নীল সেজবাতির মত।

হঠাৎ মাঠের এক কোণ থেকে ডেকে উঠল একদল শেয়াল 'হুক্কা হুয়া হুয়া, ক্যা-হুয়া, ক্যা-হুয়া।' সাথে সাথে আরেক কোণ থেকে ডেকে উঠল আরেক দল। অন্য কেউ হলে ভয়ে চোখ বন্ধ করে রাম নাম জপ করতো। কিন্তু ঐ কিশোরটি চোখ ত বন্ধ করলই না, বরঞ্চ চোখকান খোলা রেখে হাঁটতে লাগল—যদি ভূতপেত্নী দেখা যায়। হাঁটতে হাঁটতে শ্মশান এসে পড়ল। বিন্দীপাড়ার ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। তখনও একটা চিতা অল্প অল্প জ্বলছে। ঘাটের এক কোণে বট পাকুড়ের ঘন বন। ছেলেটা এদিক ওদিক একবার ঘুরে এল। না! কোথাও কিছু নেই। ভূতও নেই, পেত্নীও নেই। কোথায় ভয়? কই গা ত ছম্ ছম্ করছে না। কিছুক্ষণ কাটিয়ে, ফিরে চলল ভয়হীন দামাল কিশোর রাতের অন্ধকার অগ্রাহ্য করে।

বলতে পার, কে এই দামাল কিশোর? এই দামাল কিশোরই হচ্ছে আমাদের বিপ্লবী বীর 'বাঘা যতীন'। বাঘা যতীন ভারতের ইতিহাসের প্রথম বিপ্লবী, যিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথম ট্রেঞ্চ যুদ্ধ করেছিলেন,—বুড়িবালামের তীরে নবভারতের আরেক হলদীঘাট।

একদিকে ছিল তিনশ রাইফেল; আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বারবার গর্জে উঠছিল, অন্যদিকে ছিল পাঁচজন বিপ্লবী। চিত্তপ্রিয়, জ্যোতিষ, মনোরঞ্জন, নীরেন আর বিপ্লবী

নায়ক বাঘা যতীন। হাতে তাদের মশার পিস্তল। অসম যুদ্ধ চলল তিন ঘন্টা। তবুও এক পা এগোতে পারল না তিনশ রাইফেলধারী ইংরাজ ফৌজ। শেষ হল গুলি। লুটিয়ে পড়লেন একে একে চিত্তপ্রিয়, জ্যোতিষ ও নীরেন। ক্ষতবিক্ষত হলেন বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন। মুমূর্ষু বাঘা যতীনকে বন্দী করলেন চার্লস টেগার্ট।

———

মানুষ সবাই ভাই-ভাই

বসন্তের এক সুন্দর রাত। কাস্তিগ'লো পাহাড়ের কাছে এক শহর। সেই শহরে ছোট্ট এক সরাইখানায় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ডুনাণ্ট। পুরো নাম, জ্যাঁ হেনরী ডুনাণ্ট। সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরের এক উঠতি ব্যবসায়ী। বহুদিন থেকে তাঁর মাথায় ঘুরছে নতুন এক ব্যবসায়ী বুদ্ধি। তাঁর কারখানায় হাওয়া-কল তৈরী হয়। সেই কল আলজেরিয়াতে রপ্তানি করতে পারলে কিস্তি মাৎ। ব্যবসা তার ফুলে ফেঁপে উঠবে। কিন্তু সেখানে হাওয়া-কল পাঠাতে হলে ফরাসী-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অনুমতি চাই। কারণ—ওটা তাঁদের উপনিবেশ। অনুমতি নেওয়ার জন্যে ডুনাণ্ট এখানে ছুটে এসেছেন।

অনেক ছুটোছুটির পর আজ রাত্রে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। কম্বলের উষ্ণতায় ঘুম নেমেছে গাঢ়, আরও গাঢ় হয়ে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর কারখানার হাওয়া-কল ঘুরছে ফরাসী আলজেরিয়ার মাঠে মাঠে। আওয়াজ উঠছে—বোঁ-বোঁ সোঁ-সোঁ।

হঠাৎ হুম্ হুম্, গুম্ গুম্ শব্দ। আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিছু বোঝার আগেই আবার সমস্ত সরাইখানার বাড়িটা ঝাঁকি দিয়ে কেঁপে উঠলো। শেষ রাতের নিস্তব্ধতাকে খান্‌খান্ করে আবার জেগে উঠলো বুক কাঁপানো আওয়াজ—হুম্ হুম্ গুম্ গুম্। বুঝলেন, কামানের গোলা পড়ছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কাছে—খুব কাছেই।

ডুনাণ্ট বিছানা ছেড়ে জামা-কাপড় পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন বাইরে। যুদ্ধ দেখার কৌতূহল তাঁর বহুদিনের। পথে নেমে

দেখলেন, দলে দলে ছিন্নমূল মানুষ ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। হাঁস-মুরগী আর হাঁড়ি-কড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জামে ভর্তি গাড়ী একটার পর একটা এগিয়ে চলেছে। সাথে মানুষের মিছিল। শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে মানুষের মুখগুলো পরিষ্কার বোঝা যায় না। যাকে সামনে পাচ্ছেন, তাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, 'যুদ্ধ কোথায়? কার সাথে? আপনারা কোথা থেকে আসছেন?' কারও উত্তর দেবার অবকাশ নেই। কেউ বা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গী-সাথীদের সাথে হাঁক-ডাঁক করতে করতে এগিয়ে চলে যায়। সবাই পালাতে ব্যস্ত। এক বুড়ো উত্তর দিল, 'যুদ্ধ হচ্ছে সলফেরিনো গ্রামে। বাঁচতে চাও তো পালাও।' ডুনাণ্ট এগিয়ে চললেন উৎসাহে। তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে। যুদ্ধটা কোথায় তা জানা হয়ে গেছে। সূর্য ওঠার আগেই সলফেরিনো গ্রামের পাশের পাহাড়ের মাথায় তাকে উঠতেই হবে। ওখান থেকে যুদ্ধটা নিশ্চয়ই খুব স্পষ্ট দেখা যাবে।

ভোরের সূর্য উঠছে পাহাড়ের আড়াল থেকে। আকাশে সাজানো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। তাদের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রভাতী সূর্যের আবীর রঙ। ডুনাণ্ট দেখলেন, নিচে বিরাট প্রান্তর। সেখানে সমুদ্রের মতো শুধু সৈন্য আর সৈন্য। ভোরের আলোয় ঝিক্ ঝিক্ করে উঠছে তাদের অস্ত্রগুলো। কামান আর বন্দুকের আওয়াজ অনবরত। কানে তালা লেগে যায়। ঘোড়া ছুটছে, মানুষ ছুটছে। একজন আর একজনের উপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে কাটা গাছের মতো একের পর একজন সৈন্য লুটিয়ে পড়ছে মাটির উপর। আহত আর নিহত সৈন্যের স্তূপ জমে উঠছে ছোট টিলার মতো। কারো হাত নেই। কারো পা নেই। যন্ত্রণায় ছটফট করছে রক্তাক্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের

দেহগুলো। 'এত রক্ত! এত মৃত্যু! এত বীভৎসতা! এর নাম যুদ্ধ?' প্রলাপের মতো উচ্চারণ করেন ডুনান্ট। দু'চোখ ভরে ওঠে তাঁর জলে। প্রকৃতিও বুঝি সহ্য করতে পারে না। বীভৎস দৃশ্য সেও বুঝি দেখতে চায় না। বিকেলের আকাশে তাই মেঘ জমে ওঠে। কামানের গর্জনকে ছাপিয়ে মেঘের গর্জন জেগে ওঠে। প্রবল বৃষ্টি নামে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামে। সলফেরিনোর যুদ্ধ শেষ হ'ল।

পরের দিন, ভোরের বেলা। ডুনান্ট ছুটলেন সলফেরিনো গ্রামে। ভোরের আলোয় ভেসে উঠলো ভয়াবহ দৃশ্য। হাজার হাজার রক্তাক্ত মানুষের স্তূপ। মৃত মানুষকে ঘিরে ধরেছে শকুন আর গ্রামের কুকুর। আহতদেরও রেহাই নেই। তাদের করুণ হাহাকার ভোরের বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। বাতাসে বারুদ, রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ। ডুনান্টের বুক ব্যথায় ভরে গেল। তিনি ভুলে গেলেন—কে তিনি? কেন এসেছিলেন? আশেপাশের গ্রামবাসীদের নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেবার কাজে। কেউ আনলো কাপড়, কেউ আনলো জল, কেউ বা ক্ষতস্থান ধুয়ে বেঁধে দিতে লাগলো আহতদের। মেয়েরা সবার মুখে তুলে দিতে লাগলো পিপাসার জল। গ্রামের গির্জা ঘরের ভেতরে-বাইরে পাতা হ'ল সারি সারি খড়ের বিছানা। আহতদের তুলে এনে শোয়ানো হল। মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই ডুনান্টের। সারা গায়ে তাঁর রক্তের ছোপ-ছোপ দাগ। চোখে মুখে তাঁর অসীম ক্লান্তির ছায়া। কিন্তু চোখ দুটো যেন কোনো এক উদ্দীপনায় জ্বলছে ভোরের আকাশের তারার মতো।

সারি সারি আহত সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে বারবার তিনি হেঁটে চলেছেন। কাউকে তিনি নিজের হাতে বেঁধে দিচ্ছেন ব্যাণ্ডেজ। কাউকে দিচ্ছেন জল। কারও বা হাত ধরে দিচ্ছেন সান্ত্বনা। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটু দূরে একযোগে সব আহত

সৈনিকরা কাতরভাবে বলছে, 'জল, জল, আমাদেরও একটু জল দাও। ভগবানের দোহাই।' ডুনাণ্ট তাকিয়ে দেখলেন কেউ তাদের কথায় কান দিচ্ছে না। তাদরে সামনে দিয়ে সবাই জল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেউ জল দিচ্ছে না। ডুনাণ্ট চিৎকার করে উঠলেন, 'ওদের জল দিচ্ছো না কেন? ওদের জল দাও। জল দাও।' সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কোনো উত্তর দিল না। কেউ জল দিতে এগিয়েও গেল না। 'কি, ব্যাপার কি?' ডুনাণ্টের গলায় বিস্ময়। একজন কৃষকরমণী বলে উঠলো, 'ওরা শত্রু, ওরা অস্ট্রীয়, ওদের আমরা জল দেব না।' ডুনাণ্ট হতভম্ব হয়ে গেলেন অবাক হয়ে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বেদনার ছায়া তখন তাঁর চোখে থির্‌থির্‌ করে কাঁপছে। বিকেলের সূর্যের লাল আলো তাঁর বিষণ্ণ মুখের উপর রচনা করেছে এক মায়া-জাল। অনেকগুলো চোখ তাঁর পাথরের মতো মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলো। বহুদূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এল, 'শত্রুও তো মানুষ।' বুকচাপা নিস্তব্ধতা—কারো মুখে কথা নেই। এক বৃদ্ধা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠলো, 'তুত্তি ফ্রাতেল্লি, তুত্তি ফ্রাতেল্লি।' 'এরা সবাই ভাই-ভাই।' খুশির বাঁধ ভাঙলো। সবার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। গির্জার দেওয়ালে দেওয়ালে ধ্বনিত হ'ল সমবেত কণ্ঠে, 'তুত্তি ফ্রাতেল্লি।' গির্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করলো—ঢং ঢং ঢং। সেও যেন মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'মানুষ সবাই ভাই—ভাই।'

ডুনাণ্ট দেশে ফিরলেন। কিন্তু ভুলতে পারলেন না যুদ্ধের বিভীষিকা। দিনে-রাতে রক্তাক্ত মানুষের মিছিল তাঁকে তাড়া করে ফেরে। মনের মধ্যে একটা কথাই গুমরে গুমরে কাঁদে, যদি সেদিন একদল অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক থাকতো, যদি ওষুধ থাকতো, যদি ডাক্তার থাকতো, তবে কত মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেতো।

তাহলে কি আর তাদের সেদিন কবর খোঁড়ার কাজ করতে হতো? শুরু করলেন তিনি প্রচার—মানুষের বিবেকের কাছে। এগিয়ে এলেন চার আদর্শবাদী মানুষ। একজন আইনজীবী, একজন সেনানায়ক, আর দুইজন ডাক্তার। তাঁরা পাঁচজনে মিলে সারা পৃথিবীর বিবেককে শক্ত হাতে নাড়া দিলেন। আর তার ফলেই ২২শে আগস্ট, ১৮৬৪ সালে জন্ম নিল 'রেড্‌ক্রস্'। বিশ্বের আকাশে-বাতাসে আর একবার ধ্বনিত হ'ল,

'শত্রুও তো মানুষ!

'তুত্তি ফ্রাতেল্লি, তুত্তি ফ্রাতেল্লি'।

মানুষখেকো প্যান্থার

'টাইগার অ্যাপিয়ার্ড ইন রেড ব্যাঙ্ক টি এস্‌টেট, পি. এস. বানারহাট। পারসনস ইনজিয়োর্ড। প্রসিড এ্যাট ওয়ানস।'

সরকারী নির্দেশ এল, সরকারী হান্টার জয়ন্ত রায়ের উপর। কাজেই জয়ন্তবাবুকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে অবিলম্বে রওনা হতে হ'ল।

বানারহাট স্টেশন থেকে বাগানের জীপ পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে যখন ম্যানেজারের বাংলোয় এসে পৌঁছাল তখন পাহাড়ী শীতের সন্ধ্যা গুঁড়ি মেরে নামছে শাল শিরীষের বনে। চায়ের টেবিলে ম্যানেজার সবিস্তারে জয়ন্তবাবুকে বাঘের বিভিন্ন দৌরাত্ম্যের কাহিনী বলে গেলেন। কাহিনী থেকে জানা গেল যে কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এই বাঘ মুলতঃ ক্যাটল লিফ্‌টার ছিল। আস্তে আস্তে দেখা গেল কুলী বস্তির কুকুরগুলো একের পর এক অদৃশ্য হল। অবশিষ্ট কুকুরগুলো সন্ধ্যায় পারতপক্ষে ঘরের বাইরে আসতেই চায় না। এখন শুরু হয়েছে মানুষের উপর আক্রমণ। মূর্তিমান বিভীষিকার মত রাতের পর রাত কুলী বস্তির উপর হামলা করে চলেছে। আজ পর্যন্ত তিনটি কিশোর, দুটি শিশু ও একজন বৃদ্ধ বাঘের খাদ্য হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে বন্দুক নিয়ে ওকে খুঁজতে বের হলে, আশে পাশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিকারী যদি কখনও অন্যমনস্ক হয়েছে তবে কোথা থেকে মূর্তিমান শয়তান ধূমকেতুর মত ছিটকে এসে শিকারীকে হত্যা করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তিনজন স্থানীয় শিকারী মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।

ম্যানেজারের বিবরণ শুনে জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন, এ বাঘ তরাইয়ের রয়্যাল বেঙ্গল নয়, এ এক দুর্ধর্ষ শয়তান প্যান্থার। যার গতি অকল্পনীয়; হিংস্রতা আর চতুরতায় যার জুড়ি মেলা ভার। তার মনে পড়ে গেল স্বনামধন্য শিকারী কেনেথ এ্যাণ্ডারসনের সতর্ক বাণী, 'শুধু তোমার সফলতাই নয়, এমন কি তোমার নিজের জীবনও নির্ভর করছে তোমার সতর্কতার উপর।……মনে রেখ, যাকে তুমি শিকার করতে যাচ্ছ, শিকারীদের মধ্যে সে নিজেই হ'চ্ছে সর্বাপেক্ষা ধূর্ত শিকারী।'

জয়ন্তবাবু তাড়াতাড়ি রাতের আহার সেরে নিলেন। গেস্ট হাউসের নেপালী দারোয়ান জিতবাহাদুরকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কুলী বস্তির দিকে। সাথে রইল ডবল ব্যারেল শটগান, ৪০৫ উইঞ্চেস্টার রাইফেল আর পাঁচ ব্যাটারীর শক্তিশালী টর্চ। পায়ে হেঁটে বস্তির চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগলেন। বিশেষ করে যে দিকটার সঙ্গে ডায়না ফরেস্টের যোগ আছে। এখানে ওখানে জঙ্গল। পাহাড়ী নদীর পাথর। নিঝুম রাত। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাক। রাতের হাওয়ায় শীতের আমেজ। জয়ন্তবাবু মাথার সবুজ ব্যারেটকে কান পর্যন্ত টেনে দিলেন। আর ভাবলেন, পর্যবেক্ষণের প্রথম রাত বোধ হয় বৃথাই গেল। এই সময় পিছনের বস্তির এক কোণ থেকে হঠাৎ কয়েকটা কুকুরের গলাফাটা চীৎকার শোনা গেল। চীৎকারে আতঙ্ক। জয়ন্তবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর দ্রুত ও সংযত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন ফেলে আসা পথ ধরে। বাঁ-ধারে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী। ডায়না নদীর শাখা। নাম তুরতুরি। নদীতে অল্পই জল। নদীর পাড়ে থোকা থোকা জঙ্গল। স্থানীয় ভাষায় 'আসামী জঙ্গল'। রাস্তাটা বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের পাশেই একটা পাথর। পাথরকে ঘিরে হাল্কা

আসামী জঙ্গল। ঐ জঙ্গলের দিকে চোখ পড়তেই জয়ন্তবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। বাঁ হাত দিয়ে বাহাদুরকেও আটকে দিলেন। শিকারীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তাকে বলে দিল, 'সাবধান'!

আস্তে আস্তে বাঁ-দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বাহাদুরের হাত থেকে শটগান বদলে নিলেন। ধীরে ধীরে কাঁধের উপর চেপে ধরলেন শটগান। তারপর বাহাদুরকে ইশারা করলেন পাথরের দিকে স্পট্ করার জন্য। বাহাদুর পাকা স্পটারের মত স্পট করল। সঙ্গে সঙ্গেই ধক্ ধক্ জ্বলে উঠল একজোড়া রক্তাভ চোখ। ঠিক যেন একজোড়া আগুনের গোলা। নিশ্চয়ই মাংসাশী প্রাণীর চোখ। নতুবা চোখের প্রতিফলন রক্তাভ হবে কেন? তৃণভোজী প্রাণীর চোখ টর্চের আলোয় নীলচে দেখায়। আস্তে আস্তে দুঃসাহসী প্যান্থার মুখ বের করল পাথরের আড়াল থেকে। আলোয় ঝলসে উঠল চকচকে হলুদ রংয়ের উপর কালো কালো বুটি। মুহূর্তের মধ্যে জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন চতুর প্যান্থার এতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করছিল। আর অপেক্ষা করছিল উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য। বস্তির কুকুরগুলোই সময়মত সতর্ক করে দিয়েছে। নিশানা স্থির করলেন। শটগানের ডান ব্যারেলে বুলেট আর বাম ব্যারেলে এল জি পোরা ছিল আগে থেকেই। বলিষ্ঠ প্যান্থার ধীরে ধীরে কোমরের অংশ মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে। কুঞ্চিত হচ্ছে মুখের চামড়া। বারবার চেষ্টা করছে স্পট লাইট থেকে চোখ সরিয়ে নেবার। চোখ সরাতে পারলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বিদ্যুৎ বেগে। জয়ন্তবাবু শেষবারের মত নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে দম বন্ধ করলেন। ট্রিগারের উপর তর্জনীর ফার্স্ট প্রেসার দিলেন। বাঁ চোখ বন্ধ। ডান চোখের নিশানায় ভেসে উঠল ব্যাক সাইট—ফোর সাইটের উপর ফসফরাস লাগান চিহ্ন আর প্যান্থারের বুকের

ভাইট্যাল পয়েন্ট। তর্জনীর সেকেণ্ড প্রেশার বাড়ল। মনে মনে গুণতে থাকেন, ওয়ান—টু—

কিন্তু একি! সমস্ত অন্ধকার। বাহাদুরের হাত থেকে ঠকাস্ করে টর্চ মাটিতে আছড়ে পড়ল। জয়ন্তবাবু চমকে উঠলেন। কিন্তু বুদ্ধি হারালেন না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি চিন্তা করে নিলেন। রক্তপিপাসু প্যান্থারের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে গুলি ছোঁড়া ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় নেই। গুলি লাগুক আর না লাগুক গুলি তাকে ছুঁড়তেই হবে। নতুবা হিংস্র প্যান্থার ঝাঁপিয়ে পড়বে বাহাদুরের উপর। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে শটগান গর্জে উঠল, গুড়ুম্—গুড়ুম্।

* * *

কয়েকদিন পর। এক রাতে ঘটল ভয়াবহ ঘটনা। তুরতুরি নদীর পাশের বস্তিতে, এক কুঁড়েঘরে শুয়েছিল চারজন—স্বামী, স্ত্রী, আর ওদের মাঝখানে দুই শিশু পুত্র। একজনের বয়স দশ আর একজনের বয়স তিন। ঘরের এক কোণে জ্বলছে লাল কেরোসিন তেলের লণ্ঠন। হঠাৎ গৃহস্বামী টিরকীর ঘুম কেন যেন ভেঙ্গে গেল। টিরকী থাপা লণ্ঠনের ম্লান আলোয় ঘুম ঘুম চোখে দেখল কালো ছোপ ছোপ দেওয়া একটা প্রাণী খড়ের চালের উপর থেকে চোখের পলকে লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। তারপর আচমকা চমকে-ওঠা শিশুর কান্না। একটা চাপা গাঁউউ শব্দ। কিছু ভাল করে বোঝার আগেই প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল। টিরকীর বউ কাঞ্চী চীৎকার করে উঠল—'মেরা লাল ক্যাঁহা? মেরা লাল?' সারা কুলী বস্তিতে শুরু হ'ল চীৎকার হৈ হৈ। জয়ন্তবাবু ঝোরার পথ ধরে ছুটে এলেন বস্তির ভেতরে। টিরকীর ঘরে ঢুকে দেখলেন চতুর প্যান্থার নিঃশব্দে ঘরের চালের উপর উঠে

দুর্বল জায়গা দেখে খড় সরিয়ে ফাঁক করেছে। তারপর ঐ পথে শিকার ধরে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন প্যান্থার ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর ভবলীলা সাঙ্গ করা দরকার। নতুবা অনেক প্রাণ বিপন্ন হবে।

ভোর হতেই জয়ন্তবাবু খুঁজতে বের হলেন ছেলেটির দেহ। সাথে নিলেন দশজন সাহসী যুবক। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কোথাও শকুন উড়ছে কিনা। না, এখনও ওরা সন্ধান পায়নি। তার অর্থ কোন ঢাকা জায়গায় 'মড়ি' রেখেছে চতুর প্যান্থার। নদীর ধার দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই দেখা গেল ছেলেটার ছেঁড়া প্যাণ্ট। বালিতে পায়ের ছাপ। বনের দিকে গতি। যুবকদের সতর্ক করে দিলেন নিঃশব্দে এগোবার জন্য। পায়ের তলায় শুকনো পাতা যেন না পড়ে। মনে হচ্ছে, আশেপাশে কোথাও আধ খাওয়া দেহটা রেখে দিয়ে তার কিছু দূরে তৃপ্তিতে দিবানিদ্রা দিচ্ছে প্যান্থার। কাছেই যখন নদী তখন তাকে জল খেতে বেশী দূর যেতে হয়নি। আশেপাশের ঝোপেই হয়ত টান টান হয়ে শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে তাঁরা হালকা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সামনেই একটা বেত গাছের ঝোপ। হঠাৎ বাহাদুর জঙ্গলের আইন ভুলে আঙ্গুল তুলে ঝোপের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'ও দেখিয়ে সাব, শের……।' কথা শেষ হতে না হতেই একটা 'এ্যাউ উ" কাঠ চেরাইয়ের মত বুক কাঁপানো গর্জন। তারপর শুধু একটা হলুদ কালো রংয়ের আভা ছিটকে বেরিয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। ঝোপের পাশেই পাওয়া গেল হতভাগ্য শিশুটির দেহের ছিন্নবিচ্ছিন্ন সামান্য অংশ।

ঐ ঝোপের সামনেই বাঁধা হল মাচা। দিনের আলো থাকতে থাকতেই জয়ন্তবাবু আর রেড ব্যাঙ্ক বাগানের ম্যানেজার মিঃ স্মিথ

এসে বসলেন মাচায়। 'মড়ি' বাদেও বাঘকে লোভ দেখানো
জন্য পূর্ব ব্যবস্থামত শিকারীরা বসার পর দুজন লোক ছোট্ট একট
ছাগল নিয়ে এসে তার দড়ি শক্ত করে খোঁটায় বেঁধে দিয়ে জো
জোরে কথা বলতে বলতে চলে গেল। ফলে ছাগলটা মনে কর
সে একা, তাই ক্রমাগত ছটফট করতে লাগল। এদিকে অলক্ষে
বসে শিকারীদের শুরু হল অন্ধকারে অনিশ্চিত প্রতীক্ষা
সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার সাথে সাথে ছাগলটি গলা ছে
চীৎকার শুরু করল। জয়ন্তবাবু বুঝলেন লোভী প্যান্থার কো
কারণেই নধর ছাগলের লোভ আজ এড়াতে পারবে না, ও
আসতেই হবে। একের পর এক রাতের প্রহর গড়িয়ে যায়
জয়ন্তবাবু জাতশিকারী, অসীম তাঁর ধৈর্য। কড়াশিকারী জয়ন্তবাবু
ভয়ে মিঃ স্মিথও উসখুশ করার সাহস পাচ্ছেন না। হাতে পায়ে
খোলা জায়গায় পাহাড়ী মশক বাহিনী মনের আনন্দে রক্তপা
করে চলেছে। শিকারের অলঙ্ঘনীয় আইনে থাপ্পড় দিয়ে শ
করে মশা মারা নিষেধ। হাত পা জ্বলে যাচ্ছে। ম্লান জ্যোৎস্ন
ঘুম ঘুম ভাব স্মিথের চোখে। ছাগলটি তখনও ছটফট করছে
ক্রমাগত চীৎকার করছে। মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে ঝোপে
দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে—পরমুহূর্তে উল্টোদিকে ছুট
গিয়ে দড়ির ঝটকা টানে আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আর কাতরভা
চীৎকার করে উঠছে। ছাগলের গলার স্বর যেন বসে গেছে
হঠাৎ জয়ন্তবাবু কান খাড়া করলেন। কাছাকাছি কোথায় যে
বনের প্রহরী সম্বর খ্যাট খ্যাট করে ডেকে উঠল। চোখের দৃষ্টি তী
করে তিনি মড়ি আর ছাগলটার আশেপাশে তাকালেন। মনে হ
আবছা আবছা কি যেন একটা সচল বস্তু ধীরে ধীরে ঝোপটা ভে
করে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসছে। ছাগলের ভয়ার্ত ডাক আর
বেড়ে গেল। বুঝতে পারলেন শিকার এসেছে।

জয়ন্তবাবু রাইফেল তুলে নিলেন প্যান্থারের বডিলাইন আন্দাজে ঠিক করে নিয়ে। সেফটি ক্যাচ রিলিজ করে দিয়ে তৈরী হলেন এবং লাইট দিয়ে স্পট করার জন্য বাঁ কনুই দিয়ে আস্তে আঘাত করলেন মিঃ স্মিথকে। ঠিক সেই মুহূর্তে 'মাই গড' বলে কানফাটা চীৎকার করে উঠলেন মিঃ স্মিথ। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার দেখা গেল সতর্ক প্যান্থার মুহূর্তের মধ্যে লাফ মেরে অন্য আরেকটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্ষোভে হতাশায় জয়ন্তবাবু টর্চ জ্বাললেন গাছের দিকে। আলোতে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁরও আক্কেল গুড়ুম। দেখলেন সারি সারি কালো পাহাড়ী বিষ পিঁপড়ে নেমে আসছে গাছের এক কোটর থেকে। তাদের আক্রমণের প্রথম শিকার হয়েছেন মিঃ স্মিথ। ঘাড়ে উরুতে তরমুজের কালোবিচির মত ঝুলছে অনেকগুলো বিষ পিঁপড়ে। মারাত্মক যন্ত্রণা এদের কামড়ে। বিষ পিঁপড়ের কামড়ের যন্ত্রণা আর ছাগলটা নিয়ে ফিরে এলেন জয়ন্তবাবু।

রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের কুলী কামিনদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেল আরও গভীরভাবে। তাদের ধারণা হল এ বাঘ নিশ্চয়ই 'দেও' (ভূত) এবং অবধ্য। শুরু হল 'দেও পূজা' আর 'মুরগী বলি'। বিভিন্ন জায়গায় টোপ বাঁধলেন জয়ন্তবাবু। চতুর প্যান্থার টোপের ধার পাশ দিয়ে এল না। জয়ন্তবাবু ক্ষ্যাপা ব্লাডহাউণ্ডের মত ঘুরতে থাকলেন রাতের পর রাত। তবুও প্যান্থারকে সীমানার মধ্যে পেলেন না। চলতে থাকে শিকারী আর প্যান্থারের মধ্যে লুকোচুরি খেলা। জয়ন্তবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন, কেন বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট বলেছিলেন, 'প্যান্থার মানুষখেকো হলে সাংঘাতিক ধূর্ত এবং বিপজ্জনক হয়।' পৃথিবীখ্যাত শিকারী হাণ্টার ত এক কথাতেই বলেছেন, 'প্যান্থার এক বিভীষিকা।' নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেন জয়ন্তবাবু।

এই সময় সকাল বেলাতেই খবর আনল জিত বাহাদুর, মংরু সর্দার বাঘের হাতে মারা পড়েছে। ডায়না নদীর বাঁদিকে যে শালবাড়ি জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়েছিল বুড়ো সর্দার গতকাল বিকেল বেলায়। আজ সকালে যারা জঙ্গলে ঠিকাদারের কাঠ কাটতে যায় তারা কাজে যাওয়ার পথে মংরু বুড়ার আধখাওয়া দেহ দেখতে পেয়ে সাহেবকে খবর দিয়েছে। জয়ন্ত-বাবুর শিকারী সত্তা ভেতর থেকে যেন বলে ওঠে, 'জয়ন্ত ওঠ, এইবার শেষ সুযোগ।'

এবার গাছের উপর মাচা নয়। মড়ি থেকে কিছু দূরে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে তিন ফুট উঁচু একটা দেওয়াল তৈরী করা হল। পেছনে পড়ল কতকগুলো গাছ। পাথরের গায়ে নানা রকমের বুনো জঙ্গল গুঁজে দেওয়া হল। মাত্র দুইজন নেপালী যুবক নিঃশব্দে এই কাজ সারল। তারপর একটা টুল নিয়ে জয়ন্তবাবু একলা বসলেন পাথরের দুর্গে। মাথায় পরলেন নেপালী টুপি জঙ্গল দিয়ে সাজানো। কপালে বেঁধে নিলেন স্পট লাইটের বেল্ট। বাঁদিকে রাখলেন পাঁচ ব্যাটারী টর্চ। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখলেন তাঁর প্রিয় হল্যাণ্ড এণ্ড হল্যাণ্ড কোম্পানীর 12 Bore Paradox বন্দুক। ডান হাতে রইল তাঁর চির বিশ্বাসী ৪০৫ উইঞ্চেস্টার রাইফেল। ম্যাগাজিনে রইল velopex বুলেট। শুরু হল প্রতীক্ষা। সূর্য ডোবার আগেই অন্ধকার নেমে এল। পাখিদের কান ঝালাপালা করা কিচির-মিচির। ধীরে ধীরে তাও থেমে গেল। নেমে এল বুকচাপা নিস্তব্ধতা। মড়ির দুর্গন্ধ, চিপ্ চিপ্ করে বুনো পোকার একটানা ডাক, নিশাচর পাখির ঝট-পটানি, গাছের পাতা থেকে কখন কখন ঝরে পড়া শিশিরের টপ্ টপ্ শব্দ। আস্তে আস্তে ম্লান জ্যোৎস্না গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল। আকাশে চাঁদ উঠছে। আবছা আবছা

আলোয় ভেসে উঠল -ঘাস, পাথর, গাছ, মড়ি সব কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে মনে হয়। ঘড়িতে রাত আটটা। দূরে হঠাৎ একটা আওয়াজ, আউ আউ। নিস্তব্ধতার পর্দা যেন দুলে উঠল। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাক হঠাৎ থেমে গেল। ক্ষণিক বিরতি। আবার জঙ্গল স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কানের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা পিন্ পিন্ করছে। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ। খপ্ খপ্ চপ্ চপ্ আওয়াজ ভেসে এল। জয়ন্তবাবু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে 'মড়ির' দিকে তাকালেন। দেখলেন, ক্ষুধার্ত প্যান্থার মড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে মাংস খেতে শুরু করেছে। চোখের আন্দাজে বডিলাইন মেপে নিয়ে ধীরে ধীরে রাইফেল তুলে নিঃশব্দে সেফটি ক্যাচ রিলিজ করলেন, ফার্স্ট প্রেসার ট্রিগারে দিয়ে তারপর অতি সন্তর্পণে বাঁ হাত দিয়ে স্পট লাইট জ্বেলে দিলেন। ধক্ করে জ্বলে উঠল প্যান্থারের চোখ। দুঃসাহসী প্যান্থার মুখের গ্রাস ফেলে মুখ তুলে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল আলোর উৎসের দিকে। অনেক দিনের ক্ষুধার্ত প্যান্থার খাবারের সময় আচমকা বাধা পেয়েছে। রাগে গর গর করছে। তার স্পষ্ট প্রমাণ মাটিতে লেজ আছড়ানোতে। ধীরে ধীরে শয়তান প্যান্থার মাটির সঙ্গে দেহকে মিশিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে যাচ্ছে। বহুদিনের অভিজ্ঞ শিকারী জয়ন্তবাবু বুঝতে পারলেন, হয় আজ তাকে মরতে হবে নতুবা প্যান্থারকে মারতে হবে। মাঝে কোন পথ নেই। দেহের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে সটান অবস্থা থেকে প্যান্থার তার সরু ছিপছিপে শরীরকে ক্রমশঃ গুটিয়ে আনছে। নাকের পাশের গোঁফগুলো ক্রমশঃ খাড়া হয়ে উঠছে। মুখগহ্বর বিস্ফারিত হচ্ছে। শ্বাদন্ত স্পট লাইটের আলোয় ঝক্ ঝক্ করে উঠল মৃদু একটা চাপা গর্জন। আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব অনিবার্য ভাবে পরিস্থিতিকে আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যাবে। কিন্তু জয়ন্তবাবু কিছুতেই নিশানার মধ্যে ভাইট্যাল পয়েন্ট পাচ্ছেন না। একটু

সরলেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে স্পট লাইট চোখের উপর থেকে সরে যাবে। উপায় নেই—প্যান্থারের মাথাতেই গুলি করতে হবে। বাঘ বা প্যান্থারের ঘিলু থাকে ঠিক মাথার পেছনে। বড় বাঘের মাথার ঘিলু কমলালেবুর চেয়েও ছোট। প্যান্থারের ত আরও ছোট। সুতরাং মাথা প্যান্থারের ভাইট্যাল পয়েন্ট নয়। কিন্তু আজ উপায় নেই। প্যান্থার আক্রমণের শেষ সংকেত দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল রাইফেল, 'গুড়ুম'। কিন্তু একি! রক্তমাখা মুখ নিয়ে ছুটে আসছে প্যান্থার। হাঁ করা মুখ, আঁউ আঁউ বুক-কাঁপান গর্জন। মুহূর্তের মধ্যে চলে এল কুড়ি গজের মধ্যে। জয়ন্তবাবু একটু পাশে সরে গেলেন, কোমর লক্ষ্য করে গর্জে উঠল আবার রাইফেল। ভাঙ্গা কোমর নিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দুঃসাহসী প্যান্থার লাফ দেবার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সামনের দিকে বাড়ান দুটো থাবা, হাঁ করা রক্তমাখা মুখ, হিংস্র প্যান্থারের শেষ চেষ্টার ক্রুদ্ধ গর্জন এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করল। জয়ন্তবাবুও বুক লক্ষ্য করে আবার ট্রিগার টানলেন 'গুড়ুম'। এবার যন্ত্রণা কাতর দুর্ধর্ষ প্যান্থার রাইফেলের গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ল মাটির উপর। মৃদু আক্ষেপ দিয়ে চক্ চকে হলুদের উপর কালো বুটি বুটি দেওয়া ভয়ঙ্কর সুন্দর শরীরটা স্থির হয়ে গেল। জয়ন্তবাবুর জামা ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। কুলী বস্তির থেকে সবাই হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। কি জানি হয়ত শিকারীবাবুই এবার শিকার হয়েছেন। ওদের হাতে মশাল, টাঙ্গি, কুকরী, লাঠি। সবাই ছুটে আসছে। জয়ন্তবাবু এবার ওদের টর্চের আলোর সংকেত করলেন। ওরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। শিকারীবাবু বেঁচে আছে। কাছে এসে মৃত প্যান্থারকে দেখে—সে কি উল্লাস! বাহাদুর

ও অন্যান্যরা গাছের লতা দিয়ে বাঘের চার পা বেঁধে তার মধ্যে দিয়ে গাছের ডাল ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল রেড ব্যাঙ্ক চা বাগানের বিভীষিকা মানুষখেকো প্যান্থারকে।